POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ

মরিয়ম পুত্র ঈসা ছিল কেবল একজন রসূল। তার পূর্বের সমস্ত রসুল মৃত্যু বরণ করেছে।

(আল মায়েদা: ৭৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 35

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

2 সেপ্টেম্বর, 2021 ● 23 মহররম 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সেই সাতজন ব্যক্তি যাদের আল্লাহ্ স্বীয় ছায়ায় স্থান দিবেন

১৪১৯) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, সাতজন ব্যক্তি আছেন, যাদেরকে আল্লাহ্ সেই দিনটিকে নিজের ছায়তলে স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এবং যে খোদা তা'লার ইবাদতের মধ্যে যুবকে পরিণত হয়েছে, সেই ব্যক্তি যার মন সিজদার প্রতি আসক্ত থাকে, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাসে , যার কারণে ঐক্যবদ্ধ থেকেছে এবং যাঁর কারণে পৃথক হয়েছে, এবং সেই ব্যক্তি যাকে সম্মানীয় ও সুন্দরী মহিলা আহ্বান করেছে, কিন্তু সে (তাকে) বলেছে,' আমি আল্লাহ্ ত'লাকে ভয় করি, সেই ব্যক্তি যে সদকা করে এবং এমনভাবে গোপন করে যে তার বাম হাতও টের পায় না ডান হাত কতটুকু ব্যয় করেছে, এবং সেই ব্যক্তি যে নির্জনতায় আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন দেয়।

১৪২৪) হযরত হারিসা বিন ওহাব খাযাঈ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, সদকা কর, কেননা অচিরেই তোমাদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ সদকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর অপর এক ব্যক্তি এসে (তাকে) বলবে, 'যদি তুমি কালকে এসব নিয়ে আসতে, তবে আমি তা অবশ্যই গ্রহণ করতাম, কিন্তু আজ আর আমার এর প্রয়োজন নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৩০ শে জুলাই ,২০২১ হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

মানুষকে যে সমস্ত শক্তিবৃত্তি দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে যদি মানুষ কাজে লাগায়, সে অবশ্যই ওলীর মর্যাদা লাভ করতে পারে। কোন ব্যক্তির নিজেকে বঞ্চিত মনে করা উচিত নয়। খোদা তা'লা কি ওলীদের কোন তালিকা প্রকাশ করেছেন যাতে ধরে নিতে হবে যে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব না?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পুণ্যকর্ম চেনার উপায়

আমি তোমাদেরকে সত্যি করে বলছি, খোদা তা'লা আমাদের জটিলতা সহজ করে দিয়েছেন। কেননা আমাদের আধ্যাত্মিকতা অন্বেষণের পথ ভিন্ন। আধ্যাত্মিকতা অন্বেষণের জন্য আমাদের কোমর বাঁকিয়ে ফেলার, নখ বড় করার, পানির মধ্যে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকার, দীর্ঘদিন ধরে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকার, কিম্বা হাতকে নির্দিষ্টভাবে ভঙ্গিতে স্থির রেখে নিষ্প্রাণ করে ফেলার বা চেহারা বিকৃত করে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিছু মানুষ এমন সাধনা বলে, তাদের অলীক কল্পনায়, খোদাভীরু হতে চায়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি, এরা খোদাকে পাওয়া তো দূরের কথা, এদের মনুষ্যত্বও ক্রমে লোপ পেতে থাকে। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিকতা অন্বেষণের পথ ভিন্ন। বস্তুত, ইসলাম এর জন্য অত্যন্ত সরল পথ বর্ণনা করেছে। আর সেই প্রশস্ত পথের উল্লেখ আল্লাহ্ তা'লা এভাবে করেছেন- 'ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম' (আমাদেরকে হিদায়াতের সরল পথে পরিচালিত কর) আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া শেখানোর পাশাপাশি এর অনুষঙ্গাও সৃষ্টি করেছেন। দোয়াও শিখিয়েছেন আবার পরের সূরাতে সেই দোয়া গৃহীত হওয়ার উপকরণও সৃষ্টি করেছেন, যার দিকে ইঙ্গিত করে এই আয়াতটি- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ এটি এমন এক আমন্ত্রণ যেখানে আমন্ত্রনের উপকরণ আগে থেকেই প্রস্তুত আছে। বস্তুত মানুষকে যে সমস্ত শক্তিবৃত্তি দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে যদি মানুষ কাজে লাগায়, সে অবশ্যই ওলীর মর্যাদা লাভ করতে পারে। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি, এই জাতিতে অনেকে এমন জন্ম নিয়েছেন যারা বিরাট শক্তির অধিকারী এবং জ্যোতি, সততা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ। কোন ব্যক্তির নিজেকে বঞ্চিত মনে করা উচিত নয়। খোদা তা'লা কি ওলীদের কোন তালিকা প্রকাশ করেছেন যাতে ধরে নিতে হবে যে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব না। খোদা তা'লা বড়ই দয়ালু। তাঁর ঔদার্য এক গভীর মহাসাগর যা কখনও শেষ হবে না। কোন অন্বেষণকারী বঞ্চিত থাকে নি। তাই তোমাদের উচিত, রাতে উঠে দোয়া করা এবং তাঁর কৃপা সন্ধান করা। প্রতিটি নামাযে দোয়ার জন্য একাধিক সুযোগ আছে। যেমন- রুকু, কিয়াম, কাদা, সিজদা ইত্যাদি। ২৪ ঘন্টায় পাঁচটি নামায পড়তে হয়, ফজর, যোহর, আসর, মগরিব ও এশা। এর উর্দ্ধে ইশরাক ও তাহাজ্জুদের নামায রয়েছে। এগুলি সবই দোয়া করার মাধ্যম।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৮)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ আল্লাহ্‌র কি মহিমা, কতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে! কতই না দৃঢ় অঙ্গীকার! এর বাণীর এমনই মহিমা যে আমরা নিজেরাই এসে দেখব যে কে এই বাণীর মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হস্তক্ষেপ করে? এটি একটি অসাধারণ আয়াত, এই বিস্ময়কর আয়াতটি একাই কুরআন মজীদের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হুজরাতের ১০ নং إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

এটি একটি অসাধারণ আয়াত, এই বিস্ময়কর আয়াতটি একাই কুরআন মজীদের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ। এতে কত জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমে 'ইন্না' ব্যবহৃত হয়েছে, এরপর 'না'কে 'নাহনু' দ্বারা আরও শক্তিশালী করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আরও একটি 'ইন্না' এবং 'লাম' যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ একের পর এক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কুফফারা 'ইন্নাকা লা মাজনুন' বাক্যে দ্বিতীয়বার গুরুত্বারোপর মাধ্যমে উপহাস করেছিল। এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা বাক্যের মধ্যে গুরুত্বারোপের চারটি পদ্ধতি ব্যবহার করে বলেছেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ শোনো, আমরা, হ্যাঁ, নিশ্চয় আমরাই এই সম্মানীয় বাণী (কুরআন) কে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করেছি আর আমরা নিজের সত্তার নামে শপথ করে বলছি, নিশ্চয় আমরা নিজেরাই একে রক্ষা করব। আল্লাহ্‌র কি মহিমা, কতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে! কতই না দৃঢ় অঙ্গীকার!

এই আয়াত সম্পর্কে এই কৌতুকটিও মনে রাখার মত। কুফফারদের কটাক্ষে এই অর্থও নিহিত আছে যে, এমন মহান বাণী যা পৃথিবীকে সম্মানিত করেছে, তার সঙ্গে তো ফিরিশতাদেরও আসা উচিত ছিল। আল্লাহ্ তা'লা বলেনে, হে নির্বোধরা! তোমরা

এরপর ৮ এর পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হল্যাণ্ডের খুদ্দামদের সঙ্গে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ভার্চুয়াল মিটিং

৩০ আগস্ট, ২০২০ তারিখে হল্যাণ্ডের খুদ্দামদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভার্চুয়াল সাক্ষাত হয়। আলহামদোলিল্লাহ। সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া উসমান আহমদ সাহেব তাঁর রিপোর্টে লেখেন- 'হুযুর আনোয়ার (আই.) আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন জেনে খুদ্দামরা আহ্লাদে আপ্লুত হয়ে পড়ে। সরকারের পক্ষ থেকে করোনা বিধির কারণে আমাদের চারটি মিশন হাউসে সর্বোচ্চ ৩০ জন খুদ্দামের স্থান সংকুলান সম্ভব ছিল। সেই কারণে আমরা স্পোর্টস কমপ্লেক্স, হোটেল এবং বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায় এমন সভাগৃহ ছাড়াও বিভিন্ন ধরণে বাণিজ্যিক হলঘরেরও সন্ধান করতে শুরু করি। কোরোনা পরিস্থিতি এবং সরকারি বিধিনিষেধের কারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। আশানুরূপ স্থান পাওয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। আর হলঘর অন্তত দুই দিনের জন্য বুক করা জরুরী ছিল। একদিন অনুশীলনের জন্য এবং দ্বিতীয় দিনটি মূল অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট করতে হত। অনেক খোঁজাখুঁজির শেষে আমরা দুটি হলঘর পাই, একটি আম্সটারডাম-এ, অপরটি আলমিরেতে। তাদের প্রবন্ধকদের সঙ্গে আমরা পূর্বে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। আমস্টারডাম কাউন্সিল ঘোষণা করে যে, একশ কিম্বা ততোধিক ব্যক্তির সভার আয়োজন করতে হলে কাউন্সিলকে অবগত করা অনিবার্য। এই ঘোষণার ফলে আমস্টারডামে সভাগৃহ পাওয়ার আশা শেষ হয়ে যায়। আলমিরের সভাগৃহের ব্যবস্থাপকরা আমাদেরকে হলঘর দিতে প্রথমে নিষেধ করে দিয়েছিল।

এই সময়কালে আমি একটি সফল অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য হুযুর আনোয়ারে দোয়ার জন্য লিখতে থাকি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে এবং হুযুরের দোয়ার কল্যাণে সমস্ত ব্যবস্থা হঠাৎ করেই হয়ে যায়। আলমিরের সেই হলের মালিক, যিনি আমাদেরকে এর আগে হলঘর দিতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি নিজেই ফোন করে অত্যন্ত সঙ্গত মূল্যে আমাদের চাহিদা অনুসারে হলঘর বুক করা প্রস্তাব দিলেন। এছাড়াও তিনি অনুষ্ঠানের কিছু দিন আগে অনুষ্ঠানের অনুশীলন করার জন্য হলঘরটি এক দিনের জন্য ছেড়ে দেন, তাও আবার কোন ভাড়া ছাড়াই। উপরন্তু তিনি কোন ভাড়া না নিয়ে আমাদের যন্ত্রপাতির রাখার জন্য তিন দিনের স্টোরেজ দেওয়ারও প্রস্তাব দেন যাতে সমস্ত যন্ত্রপাতি আমাদেরকে মিশনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার না হয়। এটি হুযুরের দোয়া কবুল হওয়ার এক অসাধারণ দৃশ্য ছিল। আমাদের দলের সকল সদস্যের জন্য এটি এক ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ছিল। আলহামদোলিল্লাহ। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে মূল অনুষ্ঠানের পূর্বেই আমরা খিলাফতের আশিস থেকে সরাসরি কল্যাণমণ্ডিত হতে শুরে করেছিলাম।

অন্য একটি দল সেই হলটিকে শনিবার রাতে বুক করে রেখেছিল আর আমাদের জন্য রবিবার সকাল চারটেয় পাওয়ার কথা ছিল। তাই রেহান ওড়াইচ সাহেবের নেতৃত্বে এম.টি.এর দল সকাল চারটে থেকেই কাজ শুরু করে দেয়। ডিউটিরত খুদ্দামরা খুব বেশি হলে দুই তিন ঘন্টা করে ঘুমাত, মনে হত যেন এক অদম্য উৎসাহ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সেটআপ সম্পূর্ণ হয়েছে আর হলঘরটি অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে, ততক্ষণ তারা উন্মাদদের ন্যায় কাজ করতে থেকেছে। আলহমাদোলিল্লাহ। আমরা আনুমানিক সময়ের পূর্বেই কাজ শেষ করে ফেলেছিলাম। এমন অসাধারণ আবেগ এবং এমন বিদ্যুত গতি বস্তুত খিলাফতে আহমদীয়ার প্রতি তাদের ভালবাসা এক নিদর্শন ছিল যা স্পষ্ট দেখা ও অনুভব করা যেত।

যখন সাক্ষাত অনুষ্ঠান শুরু হল, আর আমরা হুযুর আনোয়ারকে পর্দায় দেখতে পেলাম, সেই মুহূর্তে যেন স মস্ত ক্লান্তি বাতাসে মিলিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যেন আমরা হুযুর আনোয়ারের অফিসে বসে আছি এবং তাঁর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাত করছি। হল্যাণ্ডে যেহেতু ফেসমাস্ক পরা অনিবার্য ঘোষিত হয় নি। তাই হুযুর আনোয়ার যেন খুদ্দামদের কথা স্পস্ট শুনতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান চলাকালীন আমরা মাস্ক না পরার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু মিটিং=এর শুরুতে আমি যখন মাস্ক ছাড়া হুযুর আনোয়ারকে সালাম করি, তখন হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন- 'সদর সাহেব মুখে মাস্ক পরেন নি কেন?' অতঃপর তিনি সাক্ষাতের সময় মাস্ক পরার নির্দেশ দেন। এই ঘটনা থেকে প্রকাশ পায় যে হুযুর আনোয়ার জামাতের সদস্যদের কত ভালবাসেন আর আমাদের নিয়ে কতটা চিন্তিত থাকেন!

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে কাটানো একটি ঘন্টা আমাদের আত্মাকে আলোকিত করেছে, আমাদের সংগঠনকে আরও সক্রিয় করেছে এবং আমাদেরকে বিস্ময়কর এক স্বর্গীয় শক্তিতে পূর্ণ করেছে। খুদ্দামদের মুখে আনন্দের আভা দেখার মত ছিল যার উদাহারণ খুঁজলেও দেওয়া সম্ভব নয়। এই এক ঘন্টা আমাদের মধ্যে আল্লাহ্র পথে আরও সতর্ক হয়ে চলার এবং নিজেদের দায়িত্বাবলীকে আরও বেশি নিষ্ঠা ও সংকল্প নিয়ে পালন করার শক্তি দেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রিয় হুযুরকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করুন, তাঁর পুণ্যময় নেতৃত্বে ইসলামকে অশেষ উন্নতি দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে খিলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার তৌফিক দিন। আমীন।

(উসমান আহমদ, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া হল্যাণ্ড)

কানাডার জাতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের ভার্চুয়াল সাক্ষাত

প্রিয় হুযুর (আই.) -এর অনুগ্রহ ও অনুমতিক্রমে কানাডার মজলিস লাজনা ইমাউল্লাহ্ ২০২০ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাজ্য সফর করার কর্মসূচি ছিল। ২৯ শে মার্চ হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত নির্ধারিত ছিল। কিন্তু কোভিডের কারণে এই সফর স্থগিত করতে হয়। আমার হতাশ হয়ে পড়ি এবং দোয়া করতে থাকি যে, খোদা তা'লা নিজ সন্নিধান থেকে সাক্ষাতের জন্য যেন কোন ব্যবস্থা করে দেন। এখন গোটা পৃথিবী কোরোনা মুক্ত হয় নি, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, আমরা প্রিয় হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সুসংবাদ পেলাম। খোদা তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের প্রিয় হুযুর আমাদের ন্যায় তুচ্ছ সেবিকাদের মানসিক প্রশান্তি দেওয়ার জন্য অনলাইনের মাধ্যমে সাক্ষাতের মঞ্জুরী প্রদান করেন। আল হামদো লিল্লাহ্॥ এতে আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না।

২০২০ সালের ১৬ আগস্ট বুধবার দুপুর দেড়টার সময় জামেয়া আহমদীয়ার তাহের হলে হুযুরের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হওয়ার কথা ছিল। আলহামদোলিল্লাহ, কাল আঠাশজন সদস্যার মধ্য থেকে সাতাশজন উপযুক্ত স্বাস্থ্য-সুরক্ষা বিধি মেনে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে নিজের নিজের আসনে বসে পড়েছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বংশধর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর কন্যা শ্রদ্ধেয়া সাহেবযাদী বিবি আমাতুল জামীল বেগম সাহেবাও আমাদের সঙ্গে সাম্মানিক সদস্যা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঘড়ির কাঁটা যখন দেড়টার ঘরে, ঠিক তখনই বিশাল পর্দায় প্রিয় হুযুরের হাস্যোজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডিত মুখমণ্ডল ফুটে ওঠে। সমস্ত লাজনা সদস্যা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হুযুর আনোয়ারকে সালাম নিবেদন করেন। হুযুর সালামের উত্তর দেওয়ার পর সকলকে আসন গ্রহণ করতে বলেন। এরপর তিনি আমাকে বৈঠকের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে বললেন, চলুন, দোয়ার মাধ্যমে মিটিং আরম্ভ করি। দোয়ার পর আমার ডান ও বাম দিকে বসে থাকা লাজনা সদস্যাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এরপর সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার নায়েব সদর ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত (নওমোবাইয়াত) এর সঙ্গে কথোপকথন আরম্ভ করেন। এবং একে একে প্রত্যেক সেক্রেটারীর কাজে সংশ্লিষ্ট বিভাগের খোঁজ খবর নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা ও উপদেশ প্রদান করেন। হুযুর আনোয়ার নওমোবাইয়াতদের সঙেগ দৃঢ় সম্পর্ক রাখার কথা বলেন এবং তাদেরকে সক্রিয় করে তোলার উপদেশ দেন। নতুন বয়আতের দিকেও মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেন এবং এর জন দায়ীইয়াতে ইলাল্লাহ্র সাহায্য নিয়ে ব্যপকহারে অনুষ্ঠান করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। হুযুর আকদস লাজনা সদস্যা, কচিকাচাদের তরবীয়তের বিভিন্ন পন্থার দিকে কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকষর্ণ করেন। তিনি প্রত্যেক বিভাগকে নিজের মূল্যবান ও আশিসপূর্ণ উপদেশ দান করেন এবং কাজকে আরও উন্নত করার উপর জোর দেন।

হুযুর আনোয়ার সকলের কথা শুনেছেন এবং হাসিমুখে সকলকে উত্তর দিয়েছেন। হুযুর আকদস (আই.) এর মূল্যবান সময় আমাদের জন্য নির্ধারিত করা কানাডার লাজনারে জন্য ভীষণ আনন্দের কারণ ছিল। কুদরতে সানিয়ার পঞ্চম বিকাশস্থল (পঞ্চম খলীফা)কে আমরা নিজেদের মধ্যে পেয়ে ভীষণভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। এক ঘন্টার এই জ্যোতির্মণ্ডিত বৈঠক এত দ্রুত শেষ হয়ে যাবে তা অনুমান করতে পারি নি। এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ যে তিনি আমাদেরকে খিলাফতের ন্যায় মহান নেয়ামত দান করেছেন এবং খলীফা রূপে একে স্নেহশীল, সমব্যথী এবং সকলের জন্য প্রার্থনকারী আশিসমণ্ডিত সত্তা দান করেছেন, যিনি দাজ্জালের প্রভাব-প্রতিপত্তির এমন যুগে আমাদের সকলের ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়াদিতে পথপ্রদর্শন করেন।

সাক্ষাতের দিন আমরা সকলে সদকা করেছিলাম, নফল নামায পড়েছিলাম এবং সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই আশিসময় সাক্ষাতটি আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তির কারণ হয়েছিল। বাস্তবেই আমরা অনুভব করছিলাম যেন হুযুর আমাদের মাঝেই রয়েছেন।

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) পুনরায় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কোদাল দিয়ে আঘাত করেন এবং আবার একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয় তখন তিনি (সা.) পুনরায় আল্লাহু আকবর পাঠ করেন আর বলেন, এবার আমাকে পারস্যের চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে আর মাদায়েনের শুভ্র প্রাসাসগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি।

আল্লাহ্‌র কসম! যে জাতিকে আল্লাহ্ এসব কিছু দান করেন তাদের পরস্পরের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। আর যে জাতির মাঝে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় তাদের মাঝে পরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

[হযরত উমর (রা.)]

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য। ”

মাদায়েন, মাসাবাযান, খুজিস্তান বিজয় এবং জালুলার যুদ্ধ, রাহমাহারমায এবং তুসরের ঘটনার বর্ণনা।

পাঁচজন মরহুমীনের স্মৃতিচারণ: মাননীয়া প্রফেসর সৈয়্যদ হানসীম সাঈদ সাহেবা (মহম্মদ সাঈদ সাহেবার সহধর্মিণী), মাননীয় দাউদ সুলেমান বাট (জার্মানী), মাননীয়া যাহেদা পারভীন সাহেবা (গোলাম মুস্তফা আওয়ান সাহেবের সহধর্মিণী), মাননীয় রানা আব্দুল ওহীদ সাহেব (লন্ডন), মাননীয় আল হাজ মীর মহম্মদ আলি সাহেব (বাংলাদেশ)

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ৩০জুলাই, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৩০ ওয়াফা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছিল আর তাঁর যুগে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল সেগুলোর উল্লেখ করা হচ্ছিল। মাদায়েন জয় করা সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে অবগত হয়ে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) লিখেন,

“পরিখা খনন করার সময় একটি জায়গা থেকে একটি পাথর বের হয় যা কোনভাবেই ভাঙ্গাছিল না আর সাহাবীদের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁরা তিনদিন অনবরত উপোস থাকার কারণে নিথর হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে বিরক্ত হয়ে তাঁরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, একটি পাথর আছে যা কোনভাবেই ভাঙ্গাছে না। তখন মহানবী (সা.)-এর অবস্থাও এমন ছিল যে, ক্ষুধার তাড়নায় (তিনিও) পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ সেখানে যান এবং একটি কোদাল নিয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে সেই পাথরে আঘাত করেন। লোহার আঘাতে সেই পাথর থেকে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয় তখন তিনি (সা.) উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর পাঠ করেন আর বলেন, আমাকে সিরিয়ার চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে আর খোদার কসম! এখন সিরিয়ার লাল (রঙের) প্রাসাদগুলো আমার চোখের সামনে রয়েছে। এই আঘাতের ফলে সেই পাথর কিছুটা ভেঙ্গে যায়। দ্বিতীয়বার তিনি (সা.) পুনরায় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কোদাল দিয়ে আঘাত করেন এবং আবার একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয় তখন তিনি (সা.) পুনরায় আল্লাহু আকবর পাঠ করেন আর বলেন, এবার আমাকে পারস্যের চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে আর মাদায়েনের শুভ্র প্রাসাসগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি। এবার পাথরটি আরো কিছুটা ভেঙ্গে যায়। তৃতীয়বার তিনি (সা.) পুনরায় কোদাল দিয়ে আঘাত করলে আবার একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হয় আর তিনি (সা.) পুনরায় আল্লাহু আকবর পাঠ করেন আর বলেন, এবার আমাকে ইয়েমেনের চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে, আর খোদার কসম! এখন আমাকে 'সানা'র ফটকগুলো দেখানো হচ্ছে। এবার সেই পাথরটি পুরোপুরি ভেঙ্গে স্বস্থান থেকে পড়ে যায়। এছাড়া আরেকটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, মহানবী (সা.) প্রত্যেকবার উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করেন এরপর সাহাবীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি (সা.) এসব কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন বর্ণনা করেন। আর মুসলমানরা এই সাময়িক প্রতিবন্ধকতা দূর করে পুনরায় নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অর্থাৎ পাথর ভাঙ্গার যে কাজ স্থগিত ছিল পুনরায় নিজেদের কাজে রত হন আবার পরিখা খননের কাজ আরম্ভ হয়।

“মহানবী (সা.)-এর এই দৃশ্যগুলো কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন ছিল। মোটকথা সেই কষ্টকর মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মুসলমানদের ভবিষ্যতের বিভিন্ন বিজয় ও স্বাচ্ছন্দ্যের দৃশ্যাবলী দেখিয়ে সাহাবীদের মঝে আশা এবং আনন্দ উদ্দীপনার চেতনা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাহ্যত সেই সময়কার অবস্থা এমন সংকটপূর্ণ ও কষ্টদায়ক ছিল যে, মদীনার মুনাফেকরা এসব প্রতিশ্রুতির কথা শুনে মুসলমানদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে বলতো যে, বাড়ির বাইরে পা রাখার মুরোদ নেই অথচ রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এসব নিয়ামত বা প্রাচুর্য মুসলমানদের অদৃষ্টে লেখা হয়ে গিয়েছিল। অতএব, এসব প্রতিশ্রুতি আপন সময়ে অর্থাৎ কিছু মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে আর বেশিরভাগ তাঁর খলীফাগণের যুগে পূর্ণ হয়ে মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধি ও প্রশান্তির কারণ হয়।”

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৭৭-৫৭৮)

মাদায়েন বিজয়ের প্রতিশ্রুতি হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে হযরত সা'দ (রা.)-এর হাতে পূর্ণ হয়েছে। যেমনটি মহানবী (সা.)-কে দেখানো হয়েছিল যে, মাদায়েন বিজিত হবে। এটি হযরত উমর (রা.)-এর যুগে পূর্ণ হয়েছে। কাদসিয়া জয় করার পর ইসলামী সৈন্যবাহিনী বেবিলন জয় করে। বর্তমান ইরাকের প্রাচীনতম শহর ছিল বেবিলন। বেবিলন জয়ের পর কুছা নামের এক ঐতিহাসিক জায়গায় তারা পৌঁছে। এই কুসা শহর বেবিলনের সংলগ্ন একটি অঞ্চল। এটি সেই জায়গা যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নমরূদ বন্দী করে রেখেছিল এবং বন্দীশালা তখনো সুরক্ষিত ছিল। হযরত সা'দ (রা.) যখন এই বন্দীশালা দেখেন তখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন, تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ এসব দিন এমন, এগুলোকে আমরা মানুষের মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। সৈন্যবাহিনী কুসা অতিক্রম করে বহরসীর নামক এক স্থানে গিয়ে পৌছে। এটি ইরাকের শহর মাদায়েনের একটি অংশের নাম যা দজলা নদীর পশ্চিম তিরে অবস্থিত। এখানে কিসরার শিকারী সিংহ থাকত। হযরত সা'দের বাহিনী যখন নিকটবতী হয় তখন তারা এই সিংহকে সৈন্যবাহির ওপর ছেড়ে দেয়। সিংহ গর্জে উঠে সৈন্যবাহিনীর ওপর চড়াও হয়। হযরত সা'দ (রা.)-এর ভাই হযরত হাশেম বিন আবি ওয়াক্কাস সৈন্যবাহিনীর অগ্রবতী দলের নেতা ছিলেন। তিনি সিংহের ওপর তরবারি দিয়ে এমন আঘাত হানলেন যে, সিংহ সেখানেই নিথর হয়ে পড়ে গেল। এরপর মাদায়েনের যুদ্ধও সংঘটিত হয়। মাদায়েনও ইরাকে অবস্থিত, এটি বাগদাদ থেকে কিছুটা দূরে দক্ষিণ দিকে দজলা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। এর নাম মাদায়েন রাখার কারণ কী? যেহেতু এখানে একের পর এক শহর গড়ে উঠেছিল তাই আরবরা এ অঞ্চলকে মাদায়েন তথা অনেকগুলো শহরের সমষ্টি বলতে আরম্ভ করে। মাদায়েন ছিল পারস্য-সাম্রাজ্যের রাজধানী, এখানে রাজকীয় শুভ্র প্রাসাদসমূহ ছিল। মুসলমান এবং মাদায়েনের মাঝে কেবল দজলা নদী প্রতিবন্ধক ছিল। ইরানীরা নদীর সব পুলই ভেঙে দিয়েছিল। তারীখে তবারীতে উল্লিখিত আছে যে, নদী পার হওয়ার জন্য হযরত সা'দ (রা.) নৌকা সন্ধান করেন কিন্তু জানা গেল যে, লোকেরা সব নৌকা দখল করে রেখেছে। হযরত সা'দ চেয়েছিলেন, মুসলমানরা নদী পার হয়ে চলে যাক। গ্রামের

লোকেরাও নদী পার হওয়ার রাস্তা বাতলে দিয়েছে কিন্তু তারা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে এমনটি করে নি। যাহোক, কতক গ্রাম্য লোকেরা নদী অতিক্রম করার উপায় বলে দিয়েছে যে, উমুক স্থান দিয়ে গেলে তোমরা সহজেই পার হতে পারবে। কিন্তু হযরত সা'দ এটি আমলে নেন নি। তখন নদীর পানিও বেড়ে গিয়েছিল। এক রাতে তাকে স্বপ্নে দেখানো হল, মুসলমানদের ঘোরা পানিতে নেমেছে এবং নদী অতিক্রম করে ফেলেছে অথচ সেখানে জোয়ারও ছিল। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে হযরত সা'দ (রা.) নদী অতিক্রম করার দৃঢ় সংকল্প করলেন। হযরত সা'দ সৈন্যবাহিনীকে বললেন, হে মুসলমানেরা! শত্রুরা এই নদীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আস আমরা এটি সাঁতরে অতিক্রম করি; একথা বলে তিনি নিজ ঘোরা নদীতে নামিয়ে দিলেন। হযরত সা'দ (রা.)-এর সেনারা তাদের নেতার অনুসরণে নিজ নিজ ঘোড়াও নদিতে নামিয়ে দেয় এবং ইসলামী সেনাবাহিনী নদীর অপর পারে এসে উঠে। বিরোধী সৈন্যবাহিনী এই আশ্চর্যজনক দৃশ দেখে ভয়ে ভীত হয়ে চিতৎকার করতে থাকে এবং পলায়ন করতে করতে বলে যে, রাক্ষস এসে গেছে রাক্ষস এসে গেছে। মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হয়ে শহর এবং পারস্য-সাম্রাজ্যের শুভ্রপ্রাসাদসমূহ করায়ত্ব করে নেয়। মুসলমানদের আগমনের পূর্বেই পারস্যসম্রাট তার পরিবারের লোকদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। যাহোক মুসলমানরা সহজেই শহর করায়ত্ব করে নেয়। এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হল যে ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) আহযাবের যুদ্ধের সময় পরীখা খনন করতে গিয়ে পাথরে কোদাল মারার সময় করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাকে মাদায়েনের শুভ্র প্রাসাদগুলোর পতন দেখানো হয়েছে। এসব প্রাসাদকে জনমানবশূন্য দেখে হযরত সা'দ সূরা দুখানের এই আয়াতগুলো পাঠ করেন,

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ

অর্থাৎ, তারা কত বাগান ও ঝর্ণা ছেড়ে গেল এবং শস্যক্ষেত ও মনোরম আবাসস্থল, এবং নেয়ামতরাজী, যাতে তারা পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল। বিষয়টি এভাবেই সংঘটিত হয়েছে এবং আমরা অন্য এক জাতিকে এই কল্যাণরাজীর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি।

হযরত সা'দ রাজকীয় ধনভাণ্ডার ও অমূল্য রত্নগুলোকে এক স্থানে একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন। এই ধনভান্ডারের মাঝে হাজার হাজার সংখ্যায় বাদশাহদের স্মৃতিচিহ্ন বা স্মারক ছিল, যেমন বর্ম, তরবারি, চাকু, মুকুট, রাজকীয় পোশাক ইত্যাদি। সোনার তৈরী একটি ঘোড়া ছিল যেটাতে রুপার তৈরি জিন পরানো ছিল, আর যার বুকে চুনী ও পান্না খচিত ছিল। একইভাবে রুপার তৈরী একটি উটনি ছিল যার ওপর স্বর্ণের তৈরী গদী বসানো ছিল এবং লাগাম মূল্যবান চুনী গেঁথে তৈরি করা ছিল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মাঝে একটি গালিচা ছিল যেটাকে ইরানীরা বিহার বলতো। এই গালিচায় দৃশ্যমান মাটি ছিল স্বর্ণের তৈরি, গাছগুলো ছিল রুপার তৈরি এবং গাছের ফলসমূহ ছিল বিভিন্ন মণি-মাণিক্যের তৈরি। এই সমস্ত জিনিসপত্র সৈন্যদল একত্রিত করেছিল। তবে মুসলমান সেনাদল এতটাই সৎ এবং বিশ্বস্ত ছিল যে, যে যেখানে যেই জিনিস যে অবস্থায় পেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই এনে অফিসারের নিকট উপস্থাপন করেন।" এথেকে মুসলমান সৈন্যদের বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। "অতঃপর যখন সমস্ত জিনিসপত্র একসাথে এনে সাজানো হলো এবং অনেক দূর পর্যন্ত মাঠ ঝলমল করে উঠল, তখন হযরত সা'দ এটি দেখে বিস্মিত হয়ে বলেন, 'যারা এই মণি-মাণিক্যের মাঝ থেকে নিজের জন্য কিছু উঠিয়ে নেননি, নিঃসন্দেহে তারা পরম মার্গের বিশ্বস্ত মানুষ।' যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ম অনুযায়ী বন্টন করে এক-পঞ্চমাংশ খলীফার সমীপে পাঠানো হয়। গালিচা এবং প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নসমূহ এজন্য পাঠানো হয় যেন আরবের অধিবাসীরা ইরানীদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি এবং ইসলামের সফলতা ও বিজয়ের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে যখন এই সমস্ত জিনিস উপস্থাপন করা হয়, তখন তিনিও তার সেনাদলের সততা ও বিশ্বস্ততা দেখে বিস্মিত হন।" হযরত উমর নিজেও বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, তার সেনাদল কতটা বিশ্বস্ত! "মুহাল্লম নামের এক ব্যক্তি মদীনায় ছিলেন যিনি বেশ দীর্ঘকায় ও সুশ্রী ছিলেন। হযরত উমর (রা.) আদেশ দিলেন যেন নওশেরভান [জনৈক ইরানী বাদশাহ] -এর পোশাক তাকে পরানো হয়। এসব পোশাক বিভিন্ন উপলক্ষের ছিল। অতঃপর একে একে সব পোশাক পালাক্রমে তাকে পরানো হয়। এসব পোশাকের সৌন্দর্য দেখে মানুষ বিস্ময়াভিভূত হয়। একইভাবে সেই গালিচা যার নাম বিহার ছিল, সেটিকেও বিতরণ করে দেওয়া হয়।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- আসসালাবী, পৃ: ৪১৩-৪১৭) (আল ফারুক, প্রণেতা-শিবলী নুমানী, পৃ: ১০০-১০৩) (তারিখে তাবারী (উর্দু অনুবাদ), ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৮) (মুজামুল বালদান, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৫৫৩, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৮৮,৮৯)

এরপর যে যুদ্ধ হয় তা হলো জালুলার যুদ্ধ, যা ১৬ হিজরিতে সংঘটিত হয়। মাদায়েন বিজিত হবার পর ইরানীরা জালুলা নামক স্থানে একত্রিত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। হযরত সাদ (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর আদেশে ইরানী সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য হযরত হাশেম বিন উতবা (রা.)-কে ১২ হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। জালুলা বাগদাদ থেকে খুরাসান যাওয়ার পথে ইরাকের একটি শহরের নাম। এখানে মুসলমান এবং পারস্যবাসীদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা এখানে পৌঁছে শহরটিকে অবরোধ করে রাখে। মাসের পর মাস এই অবরোধ থাকে। ইরানীরা বিভিন্ন সময় দুর্গ থেকে বাইরে এসে আক্রমণ করে। এভাবে আশিটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। মুসলমানরা জালুলার অবস্থা হযরত উমর (রা.)-কে লিখে পাঠান এবং একই সাথে এটিও লিখেন যে, হযরত কা'কা হুলওয়ান নামক স্থানে শিবিরস্থাপন করে আছেন। চিঠিতে হযরত উমরের নিকট অনরাবদের পিছু ধাওয়া করার অনুমতি চাওয়া হয়, কিন্তু তিনি (রা.)-এর অনুমতি দেন নি; তিনি বলেন, তাদের পিছু ধাওয়া করবে না। বরং তিনি বলেন, আমি চাই ইরাকের সাওয়াদ (ইরাকের দক্ষিণাঞ্চল) ও ইরানের পাহাড়ের মাঝামাঝি যদি একটি প্রাচীর প্রতিবন্ধক হিসাবে থাকত, তাহলে ইরানীরাও আমাদের দিকে আসতে পারত না এবং আমরাও তাদের এলাকার দিকে যেতাম না। আমাদের জন্য ইরাকের সাওয়াদের গ্রামাঞ্চলই যথেষ্ট। আমি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করার চাইতে মুসলমানদের নিরাপত্তাকে অগ্রগণ্য মনে করি।" আমার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত করার কোন আগ্রহ নেই। মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং তাদের প্রাণের সুরক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সাদ কুযায়ী বিন আমর দাওলী এর মাধ্যমে পঞ্চমাংশ থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ও কাপড় এবং আবু মুফাযযের আসওয়াদের মাধ্যমে বন্দীদের পাঠান। অপর এক বর্ণনামতে পঞ্চমাংশ পাঠানো হয়েছিল কুযায়ী ও আবু মুফাযযের-এর মাধ্যমে এবং এর হিসাব প্রেরণ করা হয় যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে। কেননা তিনি ছিলেন হিসাবনিকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুন্সী আর তিনিই সেগুলো রেজিস্ট্রারে সংরক্ষণ করে রাখতেন। এ সবকিছুই যখন হযরত উমর (রা.)-এর নিকট পৌঁছে তখন হযরত যিয়াদ মালে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে আলোচনা করেন এবং এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অবগত করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, এসব কথা, অর্থাৎ যাকিছু আমাকে বলছো তা কি তুমি মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে? তখন উত্তরে যিয়াদ বলেন, আল্লাহর কসম! আমার অন্তরে আপনার চেয়ে অধিক ভয় ভূ-পৃষ্ঠে আর কারো জন্য নেই। আমি যখন আপনার সম্মুখেই বলে দিয়েছি তখন অন্যদের সম্মুখে কেন বলতে পাড়ব না? অতএব যিয়াদ লোকদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতির পূর্ণ বিবরণ প্রদান করেন এবং মুসলমানরা যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে তা উল্লেখ করেন, অর্থাৎ কীভাবে যুদ্ধ হয়েছে এবং কীভবে গনীমতের মাল হস্তগত হয়েছে। একই সাথে তিনি বলেন, মুসলমানরা এ বিষয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে যে, তারা যেন শত্রুদের পিছু ধাওয়া করতে করতে শত্রুদের দেশ পর্যন্ত যেতে পারে। হযরত উমর (রা.) তার বক্তব্য শুনে বলেন, সে অনেক বড় একজন সুবক্তা। হযরত যিয়াদ বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে খুম্স (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ) উপস্থাপন করা হলে তিনি (রা.) বলেন, এখানে এত বেশি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যার সঙ্কুলান কোন ছাদের নীচে সম্ভব নয়, তাই আমি এগুলো শীঘ্রই বিরতরণ করে দিব। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম (রা.) সারা রাত ধরে মসজিদের আঙ্গিনায় এই সম্পদের প্রহরা দেন। সম্পদ এলে সেগুলোকে মসজিদের আঙ্গিনায় রাখ হয় আর এই দুই সাহাবী সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন। সকালে হযরত উমর (রা.) লোকদের সাথে মসজিদে এলে গনীমতের মালের ওপর থেকে কাপড় উঠানো হয়, তখন তিনি (রা.) ইয়াকুত, যবরজদ এবং অনেক মূল্যবান অলঙ্কারাদি দেখে কাঁদতে আরম্ভ করেন। (এ প্রেক্ষিতে) হযরত আব্দুর রহমান (রা.) হযরত উমর (রা.) -এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ্র কসম! এটি তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময়। তখন হযরত উমরা (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! এ বিষয়টি আমাকে কাঁদায় নি। আল্লাহ্র কসম! যে জাতিকে আল্লাহ্ এসব কিছু দান করেন তাদের পরস্পরের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। তোমাদের কাছে যে সম্পদ আসছে এর ফলে তোমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে হিংসা ও বিদ্বেষ যেন সৃষ্টি না হয়ে যায়- এই চিন্তা আমাকে কাঁদিয়েছে। আর যে জাতির মাঝে পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় তাদের মাঝে পরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৮-৪৭১) (সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- আসসালাবী, পৃ: ৪২০) (আল ফারুক, প্রণেতা-শিবলী নুমানী, পৃ: ১০৪) (তারিখে তাবারী (উর্দু অনুবাদ), ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৮) (মুজামুল বালদান, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৫৫৩, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৮৮,৮৯)

এটি খুবই চিন্তার একটি বিষয় এবং ইস্তেগফার করারও বিষয় যা তিনি (রা.) বলেছেন আর এগুলোই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। বিত্ত -বৈভব বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে মুসলমানদের মাঝে হিংস ও বিদ্বেষও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যাদের তেল সম্পদ রয়েছে অথবা যাদের কাছে অন্য কোন সম্পদ এসেছে তাদের মাঝেও রয়েছে, এককভাবে দেখলেও একই অবস্থা। তাকওয়ার ক্ষেত্রে (সবারই) দুর্বলতা।

মাদায়েনের যুদ্ধের সময় ইরানের সম্রাট ইয়াযদাজার্দ তার রাজধানী মাদায়েন ছেড়ে তার বংশধর ও কর্মচারীদের সাথে হুলুয়ানের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। জলুলার পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর ইয়াযদাজার্দ হুলুয়ান ছেড়ে জ্যা-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং খসরু শনুমকে হুলুয়ানের সুরক্ষার জন্য কিছু সৈন্যসহ রেখে আসে, সে একজন নামকরা সেনাপতি ছিল। কিছু সেনাদলসহ তাকে সেখানে রেখে যায়। হযরত সা'দ (রা.) স্বয়ং জলুলাতে অবস্থান করেন এবং হযরত কা'কা (রা.)কে হুলুয়ানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। হযরত কা'কা (রা.) হুলুয়ান থেকে ৩ মাইল দূরত্বে অবস্থিত কাসরে শীরীরের নিকট পৌঁছার পর খসরু শনুম নিজে এগিয়ে এসে মোকাবিলা করে কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। হযরত কা'কা (রা.) হুলুয়ান পৌঁছে সেখানেই অবস্থান নেন এবং চতুর দিকে শান্তির বার্তা প্রচার করিয়ে দেন। বিভিন্ন দিক থেকে গোত্রপতিরা এসে এসে জিযিয়া দেয়ার (বিষয়টি) কবুল করে যেত এবং (তারা) ইসলামের সাহায্যার্থে যাতায়াত করত।

(আল ফারুক, প্রণেতা-শিবলী নুমানী, পৃ: ১০০-১০৩) (আল আখবারুত তওয়াল, ওয়াকেয়াতুল কাদসিয়া, পৃ: ১৮৩)

মাসাবযান-এর বিজয় কীভাবে হয়েছিল! এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, জলুলা যুদ্ধের সেনাপতি হযরত হাশেম বিন উতবা (রা.) মাদায়েনে ফিরে এসেছিলেন আর হযরত সা'দ (রা.) তখনো মাদায়েনেই অবস্থান করছিলেন। ইতোমধ্যে খবর আসে- একটি ইরানী সেনাদল আযিন বিন হুরমুযানের নেতৃত্বে মুসলমানদের সাথে মোকাবিলার জন্য মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হযরত সা'দ (রা.) এই রিপোর্ট হযরত উমর (রা.)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। ফলে হযরত উমর (রা.) এই দিকনির্দেশনা প্রদান করেন যে, যিরার বিন খাত্তাব (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করা হোক যার সম্মুখ সেনাদের নেতৃত্ব থাকবে ইবনে হুযায়েলের হাতে এবং আব্দুল্লাহ বিন ওহাব রাসবি ও মাযারেব বিন ফালাহ ইজলী পার্শ্ব (দুই) সেনাদলের নেতৃত্ব দিবে। ইসলামী সেনাবাহিনী ইরানী সেনাবাহিনীর মোকাবিলার জন্য রওয়ানা হয় এবং মাসাবযানের উন্মুক্ত সমভূমি অঞ্চলের নিকটে শত্রুদের মুখোমুখি হয় আর হানদাফ নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘঠিত হয় যাতে ইরানীরা পরাজয় বরণ করে। পরে মুসলমানরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মাসাবযান শহরের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। নগরবাসী শহর ছেড়ে পালিয়ে যায় কিন্তু যিরার বিন খাত্তাব (রা.) তাদেরকে এ আহ্বান জানান যে, তোমরা নিজেদের শহরে এসে শান্তি ও নিরাপদে বসতি স্থাপন কর। তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং নিজেদের বাড়িঘরে বসবাস করতে আরম্ভ করে।

(তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৫)

মাসাবযানের বিজয় সম্পর্কে বালাযুরি বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর একটি রেওয়ায়েত হলো আবু মুসা আশারী নাহাওন্দের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে কোন ধরণের যুদ্ধ ছাড়াই এই শহরটি জয় করেছিলেন।

(তারিখে ইসলাম বি আহদে হযরত উমর রাজিআল্লাহু আনহু, প্রণেতা-সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব, পৃ: ১২০) (ফুতুহুল বালদান আল্লামা বালাযারী, পৃ: ১৮৫)

খুজিস্তান ইরানের একটি প্রদেশ, খুজিস্তান বিজয়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হারমুযান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই প্রদেশের গভর্ণর ছিল। এই অঞ্চল এবং এখানকার অধিবাসীদের খুজ বলা হত, এর অর্থ খুজিস্তানের অধিবাসী। এটি আহওয়াজের পাশের পারস্য, বসরা, ওয়াস এবং উস্ফাহানের পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা।

১৪ হিজরীতে হযরত উমর (রা.) সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কতক সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করে ইরাকে স্বল্প পরিসরে দ্বিতীয় একটি ফ্রন্টের সূচনা করেন এবং উতবা বিন গাযওয়ানের নেতৃত্বে একটি ছোট সেনাদল এই স্থা নের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, যেখানে প্রারম্ভেই এই সেনাবাহিনীর জন্য সেনাছাওনি হিসেবে বসরা শহরের গোড়াপত্তন করা হয়েছিল। এই সেনাদল কেবল আশপাশের শত্রুদের এলাকাই জয় করে নি বরং ইরাকী যুদ্ধাভিযান এভাবে ফলপ্রসূ হচ্ছিল যে, আশপাশের ইরানী সেনাবাহিনী তাদের সঙ্গীসাথিদের বৃহৎ পরিসরে ধারাবাহিক পরাজয় বরণের সংবাদ শোনার পরও তাদেরকে সহযোগিতার জন্য যেতে পারছিল না। মনেহয় এই পথের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া বা এখানে সেনা স্থাপনের সবচেয়ে বড় যে উদ্দেশ্য ছিল তা হলো সেখানে যেন ইরানী সেনাবাহিনীর সহায়ক সেনা এবং সাহায্য ও সহযোগিতা পৌঁছতে না পারে আর তারা যেন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। এই সেনাদলের প্রধান হজ্জ করার জন্য এবং হযরত উমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে হিজায ফিরে গিয়েছিলেন আর তার অনুপস্থিতিতে হযরত উমর (রা.) এই সেনাদলের নেতৃত্বের ভার হযরত মুগিরা বিন শো'বা (রা.)-এর ওপর ন্যাস্ত করেন। হযরত মুগিরা বিন শো'বার ওপর যখন এক নৈতিকস্খলনের অভিযোগ উঠে তখন এটি তদন্তের জন্য হযরত উমর (রা.) তাকে পদচ্যুত করে মদীনায় নিয়ে এসেছিলেন আর তার স্থলে হযরত আবু মূসা আশারী (রা.)কে কমান্ডার নিযুক্ত করেছিলেন। যাহোক হযরত মুগীরার ওপর যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তদন্তের তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৮-৪৪২) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১১৬)

রেওয়ায়েতে ১৬ হিজরী বা ১৭ হিজরীর মাঝে কিছুটা বিরোধ রয়েছে। ১৬ কিংবা ১৭ হিজরী সনে ইসলামী সেনাবাহিনীর ব্যস্ততাও অনেক বেশি ছিল এবং এই যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক ব্যস্ততাও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল আর মুসলমানরা খুজিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর আহওয়াজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ঐতিহাসিক তবারী এটিকে ১৭ হিজরীর ঘটনা বলে উল্লে খ করেছেন, কিন্তু সেই সাথে তিনি এটিও লিখেছেন যে, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিজয়ের বছর ১৬ হিজরী বলে মনে হয়। এই বিজয়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেন, তখন উতবা বিন গাযওয়ানই সেনাপ্রধান ছিলেন, কিন্তু বালাযুরি এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আহওয়াজ এবং এর পরবর্তী বিজ য়গুলো হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর ফিরে আসার পর হযরত মুগিরা বিন শো'বা এবং হযরত আবু মূসা আশারী (রা.)-এর নেতৃত্বে হয়েছিল। তিনি লিখেন, হযরত মুগীরা আহওয়াজ বিজয় করেন। আহওয়াজের রইস বেহ্রুয প্রথমে মোকাবিলা করলেও পরবর্তীতে চুক্তি করে নেয়। কিছু দিন পর যখন হযরত মুগীরার স্থলে আবু মূসা আশারী (রা.) বসরার ইসলামী সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন তখন রইস বেহ্রুয চুক্তি ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করে। এ অবস্থায় হযরত আবু মূসা আশারী (রা.) তাকে প্রতিহত করা উদ্দেশ্যে বের হন এবং যুদ্ধের পর শহরের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। এ ঘটনাটি ১৭ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

আহওয়াজের যুদ্ধে ইসলামী বাহিনী অনেক লোককে আটক করে দাস বানিয়ে নেয়। কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে সবাইকে মুক্ত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ (ইসলামে) কোন দাসত্ব নেই। যেসব কয়েদী ছিল তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন। স্বাধীন করে দেন। তবারী লিখেন, এই এলাকায় ইরানীরা দুই পথ দিয়ে মুসলমান বাহিনীর ওপর বার বার আক্রমণ করত। এই দুই পথে 'নাহার তিরা' এবং 'মুনাজের' ছিল ইরানী গেরিলা যোদ্ধাদের কেন্দ্র। এই দুটি জায়গাই মুসলমানরা দখল করে নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই, যেখানে যেখানে মুসলমানদের উত্যক্ত করা হত এবং বার বার আক্রমণ করা হত, সেখানেই মুসলমানরা পরে আক্রমণ করত এবং সেই জায়গা দখল করে নিত। অতএব বালাযুরি লিখেছে, হযরত আবু মূসা আশারী (রা.) 'নাহার তিরা'কে আহওয়াজের সাথে জয় করেন। আহওয়াজ বিজয়ের পর তিনি দ্বিতীয় স্থান, অর্থাৎ মুনাজেরের দিকে অগ্রসর হয়ে শহর অবরোধ করেন আর যুদ্ধ ভয়াবহরূপ ধারণ করে। এই অবরোধের সময় এক দিন এক মুসলমান বীর মুহাজের বিন জিয়াদ রোযা রেখে আপন প্রাণ খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মানসে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে বের হন। মুহাজেরের ভাই রাবি সেনাপ্রধান আবু মূসা আশারী (রা.)কে বিষয়টি অবগত করে বলেন, মুহাজের রোযা রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে। একথা শুনে হযরত আবু মূসা (রা.) এ ঘোষণা করিয়ে দেন যে, যারা রোযা রেখেছে তারা হয় রোযা ভেঙ্গে ফেলুক আর না হয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবে না। মুহাজের এই ঘোষণা শুনে এক ঢোক পানি পান করে ইফতার করেন এবং বলেন, আমীরের আদেশ পালনের জন্যই এমনটি করছি অন্যথায় আমার একদমই তৃষ্ণা ছিল না। একথা বলে অস্ত্র হাতে তুলে নেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। শহরবাসী তার শিরচ্ছেদ করে রাজপ্রাসাদের সুউচ্চ মিনারে টাঙিয়ে রাখে। অবরোধ দীর্ঘ হচ্ছিল। হযরত আবু মূসা আশারী (রা.) সম্ভবত হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশেই সেনাবাহিনীর একটি অংশকে মুহাজেরের ভাই রাবির নেতৃত্বে মানাজ অবরোধের জন্য প্রেরণ করেন আর নিজে সূস শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এদিকে রাবি যুদ্ধ করতে করতে শহর দখল করে নেন এবং অনেক লোককে বন্দি করেন, কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে এখানেও সব বন্দিকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। হযরত আবু মূসা আশারী (রা.) সূসের দিকে অগ্রসর হন। নগরবাসী প্রথমে প্রতিরোধ গড়ে তুলে, কিন্তু যুদ্ধের পর তার শহরের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। অবশেষে রসদের ঘাটতি দেখা দিলে তারা অস্ত্রোসমর্পণ করে।

এসব বিজয়ের ঘটনার বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব তার গবেষণাপত্রে যে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন তা হলো, তবারী ও বালাযুরিতে বেশ কিছু মতভেদ রয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এটি মনে হয় যে, অত্র অঞ্চলে ইরানী নেতাদের চুক্তিভঙ্গের পর বিদ্রোহ করার ফলে মুসলমান সেনাবাহিনীর পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ঘটনাবলী বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রথমবারের বিজয়ের ঘটনাবলীর সাথে মিলে গুলিয়ে গেছে।

[তারিখে ইসলাম বি আহদি হযরত উমর (রা.), প্রণেতা-সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব নাসের, পৃ: ১২৪-১২৭] (ফুতুহুল বালদান, পৃ: ২২৫-২২৬)

অর্থাৎ পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তীতে যেসব বিজয় অর্জিত হয়েছিল।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

কিন্তু যাহোক এটি তার একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামত।

(এরপর রয়েছে) রামাহুরমুয এবং তুস্তারের যুদ্ধ। ইরানের সম্রাট ইয়াযদাজার্দ জলুলার যুদ্ধের পর ইয়াস্তাখার চলে গিয়েছিল। ইয়াস্তাখারও একটি জায়গার নাম। তখনো সে পরাজয় মেনে নেয় নি, বরং মুসলমানদের মোকাবিলা করারজন্য লোকদের উস্কানী দিচ্ছিল এবং যেখানকার বিজয়ের কথা আমি উল্লেখ করছি সেই খুযিস্তান এলাকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়ক সৈন্য প্রেরণের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করছিল। অত্র অঞ্চলে যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ ছিল এখানকার এক প্রসিদ্ধ নেতা হরমুযান এর মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা। হরমুযান কাদসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেখানে পরাজিত হয়ে নিজ দেশে ফিরে এসেছিল আর এখানে এসে মুসলমানদের ওপর অনবরত অতর্কিত আক্রমণ করে যাচ্ছিল।

[তারিখে ইসলাম বি আহদি হযরত উমর (রা.), প্রণেতা-সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব নাসের, পৃ: ১২৭-১২৮] (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৩,৪৯৪)

জালূলায় মুসলমানদের বিজয়ের পর ইরানীরা হরমুযান এর নেতৃত্বে রামাহরমুয-এ একত্রিত হয়। রামাহরমুয-ও খুযিস্তানের পাশেই অবস্থিত এক প্রসিদ্ধ শহর ছিল। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হযরত উমর-এর নির্দেশে নো'মান বিন মুকাররিনকে সেনাদলের নেতা বানিয়ে কূফা থেকে প্রেরণ করেন আর হযরত আবু মূসা আশআরী -কে বসরা থেকে প্রেরণ করেন এবং বলেন, যখন উভয় সেনাদল একত্রিত হবে তখন আবু সাবরা বিন রোম তাদের অধিনায়ক হবেন। নো'মান বিন মুকাররিনের বাহিনী সম্পর্কে হরমুযান যখন অবগত হয়, তখন সে (তাদের) মোকাবিলা করে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর হরমুযান পরাজিত হয়ে তুসতার-এ পলায়ন করে। তুসতার-ও খুযিস্তান থেকে এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি বড় শহর; সেই শহরে সে রুদ্ধদ্বার অবস্থান নেয়। হযরত আবু সাবরা-র নেতৃত্বে ইসলামী বাহিনী শহর অবরোধ করে, যা কয়েক মাস পর্যন্ত চলমান থাকে। ইরানী বাহিনী বার বার বাহিরে এসে আক্রমণ করত এবং ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে নিত। এভাবে এই যুদ্ধে আশিটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। শেষ লড়াইয়ে মুসলমানরা প্রচণ্ড আক্রমণ করে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে যখন অবরোধ কঠোর হয়ে যায় তখন দু'জন পারস্যবাসী মুসলমানদের বলে যে, শহর থেকে পানি নিষ্কাশনের পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে শহর জয় করা সম্ভব। অতএব মুসলমানরা (সেই পথে) শহরে প্রবেশ করে।

এ সম্পর্কে 'আখবারুত্ তিওয়াল'-এর প্রণেতা আবু হানিফা দিনাওয়ারি লিখেছেন যে, "মুসলমানদের অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়। এক রাতে শহরের এক সম্মানিত ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশআরি-র কাছে আসে আর নিজের পরিবারপরিজন এবং নিজ সম্পদের নিরাপত্তার বিনিময়ে শহরের দখল নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তার প্রস্তাব দেয়। হযরত আবু মূসা আশআরী তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। ফুতুহুল বুলদান-এ লেখা আছে যে, সেই ব্যক্তি মুসলমানও হয়ে গিয়েছিল। সেই ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশআরীকে বলে, আমার সাথে কাউকে প্রেরণ করুন যেন আমি তাকে বলে দিতে পারি, অর্থাৎ পথ দেখিয়ে দিতে পারি যে, কীভাবে মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করতে পারবে। হযরত আবু মূসা আশআরী বনু শা'বান গোত্রের এক ব্যক্তি আশআস বিন অওফকে তার সাথে প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে ছোট একটি নালা দিয়ে গিয়ে একটি সুড়ঙ্গপথে শহরে প্রবেশ করে। সে আশআস বিন অওফ-কে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দেয় এবং তাকে বলে, 'তুমি আমার পেছনে পেছনে আমার ভৃত্যের ন্যায় চল।' সে তাকে নিয়ে শহরের সবখানে ঘোরাফেরা করে। অতঃপর সে শহরের প্রবেশদ্বারে যায় যেখানে প্রহরীরা ছিল। এরপর সে হরমুযান-এর কাছে যায়, যে কিনা নিজ প্রাসাদের দ্বারে সভার আয়োজন করে বসে ছিল। এই সমস্ত কিছু দেখানোর পর সে তাকে একই পথ দিয়ে ফিরিয়ে আনে। আশআস বিন অওফ ফিরে এসে হযরত আবু মূসা আশআরীকে সবকিছু অবগত করেন। আশআস বিন অওফ বলেন, 'আপনি আমার সাথে দুই শত বীর সৈনিক প্রেরণ করলে আমি প্রহরীদের হত্যা করে প্রবেশদ্বার খুলে দিব আর আপনি বাহির থেকে এসে আমাদের সাথে যোগ দিবেন।' এভাবে আশআস বিন অওফ নিজ সঙ্গীদের নিয়ে উক্ত গোপন পথে শহরে প্রবেশ করেন আর প্রহরীদের হত্যা করে শহরের প্রবেশদ্বার খুলে দেন। মুসলিম বাহিনী 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করে শহরে প্রবেশ করে। হরমুযান সেই ধ্বনি শুনে নিজ দুর্গে গিয়ে পালায় যা সেই শহরের ভেতরেই ছিল। মুসলমানরা দুর্গ অবরোধ করে নেয়। হরমুযান ওপর থেকে দেখে বলে, 'আমার তূণীরে একশ' তীর রয়েছে। যতক্ষণ এগুলোর মধ্য থেকে একটি তীরও অবশিষ্ট থাকবে আমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না। এরপর আমি যদি বন্দী হই তাহলে আমার বন্দী হওয়া কতই সৌভাগ্যের!' মুসলমানরা বলে, 'তাহলে তুমি কী চাও?' সে বলে, 'আমি এই শর্তে অস্ত্র সমর্পণ করছি যে, আমার সিদ্ধান্ত হযরত উমরের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। হরমুযান অস্ত্র ফেলে দেয় এবং মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। হযরত আবু মূসা আশআরী হরমুযানকে হযরত আনাস বিন মালেক এবং আহনাফ বিন কায়েসের তত্ত্বাবধানে মদিনায় হযরত উমরের সমীপে পাঠিয়ে দেন। যখন সেই কাফেলা মদিনায় প্রবেশ করে তখন তারা হরমুযানকে তার নিজের রেশমী পোশাক পরিধান করায় যার ওপর স্বর্ণের কারুকাজ করা ছিল। অর্থাৎ, যদিও সে বন্দী ছিল, কিন্তু তাকে পোশাক পরিয়ে দেয়, যা অত্যন্ত দামী পোশাক ছিল। তার মাথায় হীরাখচিত মুকুটও পরানো হয়, যেন হযরত উমর এবং (মদিনার) মুসলমানরা তার প্রকৃত রূপ দেখতে পারেন; অর্থাৎ, একথা বোঝানোর জন্য যে, দেখ, এত বড় একজন নেতাকে আমরা পরাজিত করেছি! এরপর তারা হযরত উমর কোথায় জানতে চাইলে লোকজন বলে, তিনি মসজিদে আছেন। তারা যখন মসজিদে পৌঁছেন তখন হযরত উমর নিজের পাগড়ি মাথার নীচে দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। হরমুযান জিজ্ঞেস করে, উমর কোথায়? মানুষজন বলে, তিনি ঘুমাচ্ছেন। তখন তিনি ছাড়া মসজিদে আর কেউ-ই ছিল না। হরমুযান জিজ্ঞেস করে, তাঁর প্রহরী ও দারোয়ান কোথায়? মানুষজন বলে, তাঁর কোন প্রহরী, লিপিকার, সভাসদ, পারিষদ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। তখন হরমুযান অবলীলায় বলে ওঠে যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন নবী হবে! মানুষজন বলে, তিনি নবী না হলেও নবীদের আদর্শে অবশ্যই অধিষ্ঠিত। লোকজনের কথায় হযরত উমর জেগে উঠেন। হযরত উমর জিজ্ঞেস করেন, হরমুযান এসেছে নাকি? মানুষ বলে, হ্যাঁ। হযরত উমর তখন তাকে ও তার পোশাক-আশাক গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলেন, আমি আগুন থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। কাফেলার সদস্যরা বলেন, এ হলো হরমুযান, তার সাথে কথা বলে নিন। তিনি বলেন, কক্ষনো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও অলংকারাদি খুলে ফেলছে। তখন তার সব অলংকারাদি ও রাজকীয় পোশাক-আশাক খুলে দেওয়া হয়। হরমুযানের সাথে আলাপ আরম্ভ হয়। হযরত উমর তাকে বলেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও প্রতারণার ফল দেখেছ? অর্থাৎ, যেই যুদ্ধ হয়েছিল বা লড়াই চলছিল, তা তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে এবং প্রতারণা করার কারণে হচ্ছিল। সে বলে, অজ্ঞতার যুগে যখন খোদা আমাদের দু'জনের মধ্যে কারো সাথেই ছিলেন না, তখন আমরা তোমাদের উপর জয়ী ছিলাম। কিন্তু এখন খোদার সাহায্য তোমাদের সাথে রয়েছে, তাই এখন তোমরা জয়ী হয়েছ। অর্থাৎ, হযরত উমরকে হরমুযান এই উত্তর দেয়। হযরত উমর বলেন, অজ্ঞতার যুগে তোমরা এজন্য জয়ী ছিলে যে, তোমাদের মাঝে ঐক্য ছিল এবং আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ ছিল। এটিও একটি বড় কারণ ছিল যে, তোমরা ঐক্যবদ্ধ ছিলে আর আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ ছিল। এরপর হযরত উমর হরমুযানকে প্রশ্ন করেন যে, তুমি বারংবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ; এখন তুমি কী অজুহাত দেখাবে? যেমনটি আমি বলেছি, মুসলমানরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল; কেননা তারা শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে চাইত না। হরমুযান বলে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমি এর উত্তর দেয়ার আগেই আপনি আমাকে হত্যা না করে ফেলেন! হযরত উমর বলেন, ভয় পেয়ো না। তখন হরমুযান পানি চাইলে তার জন্য পুরোনো একটি পাত্রে করে পানি আনা হয়। হরমুযান বলে, আমি পিপাসায় মারা গেলেও এমন পাত্রে পানি পান করব না! অতএব তার জন্য যথোপযুক্ত পাত্রে পানি দেয়া হয়, তখন তার হাত কাঁপতে থাকে। হরমুযান বলে, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি যখন পানি পান করতে থাকব, তখন আমাকে হত্যা করা হবে। হযরত উমর বলেন, যতক্ষণ তুমি পানি পান শেষ না করছ, তোমাকে কোন কষ্ট দেওয়া হবে না। একথা শুনে সে পানি মাটিতে ফেলে দেয়। সে খুব চতুর ছিল; সে ভাবল, ঠিক আছে, পানি পান করা যদি শর্ত হয়ে থাকে, মুসলমানরা যেহেতু প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর, অতএব আমি পানি-ই পান করব না। এই ভেবে সে পানি মাটিতে ফেলে দেয়। হযরত উমর বলেন, তাকে আবার পানি দাও এবং তাকে যেন তৃষ্ণার্ত অবস্থায় হত্যা করা না হয়। তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের কারণে শাস্তি তো এটি-ই (অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড) অবধারিত ছিল। হরমুযান তখন বলে যে, আমার পানির তৃষ্ণা পায় নি, আমি তো এভাবে নিরাপত্তা লাভ করতে চাইছিলাম। অর্থাৎ, অবশেষে সে সত্য স্বীকার করে। এরপর হরমুযান ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদিনাতেই বসবাস করতে থাকে। হযরত উমর তার জন্য দুই হাজার মুদ্রা ভাতা নির্ধারণ করেন।

(সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- আসসালাবী, পৃ: ৪২২-৪২৫) (আল আখবারুত তওয়াল, প্রণেতা আল্লামা আবু হানীফা দিনুরী, পৃ: ১৮৮-১৯০) (মুজামুল বালদান, ৩য় খণ্ড,পৃ: ১৯, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪) (ফুতুহুল বালদান, পৃ: ৫৩৬)

'ইকদুল ফরিদ'-এ লিখা আছে যে, হরমুযানকে যখন বন্দি করে হযরত উমরের কাছে নিয়ে আসা হয়, তখন তিনি (রা.) তাকে ইসলামগ্রহণের আহ্বান জানান, কিন্তু হরমুযান তা অস্বীকার করে। হযরত উমর (রা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাকে হত্যা করতে গেলে সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি দয়া করে অ ামাকে পানি পান করান। হযরত উমর তাকে পানি পান করানোর নির্দেশ দেন। যখন পানির পাত্র তার হাতে দেয়া হয় তখন সে হযরত উমরকে বলে, পানি পান করা পর্যন্ত কি আমি নিরাপদ? হযরত উমর বলেন, হ্যাঁ। এতে হরমুযান পানির পাত্র হাত থেকে ফেলে দেয় আর বলে, তাহলে আপনি আপনার ওয়াদা পূর্ণ করুন। হযরত উমর বলেন, আমি তোমাকে কিছুটা অবকাশ

দিচ্ছি। আর দেখব যে, তুমি কী আমল কর। যখন তরবারি তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন হরমুযান বলে, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ'। অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই; তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, আর এই (সাক্ষ্যও দিচ্ছি) যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। হযরত উমর হরমুযানকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি পূর্বেই ঈমান আনলে না কেন? এতে হরমুযান বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার আশঙ্কা ছিল, মানুষ যেন একথা না বলে যে, আমি তরবারির ভয়ে মুসলমান হয়েছি, যেহেতু আমার মাথার উপর তরবারি ধরে রাখা হয়েছিল। এরপর হযরত উমর ইরানে সেনাবাহিনী পরিচালনার ব্যাপারে হরমুযানের সাথে পরামর্শ করতেন আর তার পমামর্শ অনুসারে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতেন।

(ইকদুল ফরিদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৪)

পরবতীতে সে হযরত উমরের উপদেষ্টায় পরিণত হয়েছিল।

এটিও সন্দেহ করা হয় যে, হযরত উমরের শাহাদতের ঘটনায় হরমুযানের হাত ছিল। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই সন্দেহকে সঠিক বলে মনে করতেন না। বস্তুতঃ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কিসাসের আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর কাছে এক মুসলমানকে নিয়ে আসা হয়, যে চুক্তিবদ্ধ এক কাফেরকে হত্যা করেছিল, যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা হয়ে গিয়েছিল; অর্থাৎ যার সাথে চুক্তি হয়েছিল, যাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তাকে হত্যা করেছিল। তিনি (সা.) তাকে হত্যা করার আদেশ দেন আর বলেন, আমি অঙ্গীকার পূর্ণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অঙ্গীকার রক্ষাকারী। যার সাথে চুক্তি হয়েছে তাকে কেন হত্যা করলে- এ কারণে শাস্তিস্বরূপ এক মুসলমানকেও হত্যা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তিবরানী হযরত আলী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, একবার এক মুসলমান এক বিধর্মী প্রজাকে হত্যা করে। এতে তিনি সেই মুসলমানকে হত্যার নির্দেশ দেন। কিছু লোক বলে, এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'লা ইয়ুকতালু মু'মিনুন বিকাফিরিন', অর্থ: কোন কাফেরের বিপরীতে কোন মু'মিনকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ হাদিসটি লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত প্রকৃত শব্দমালা হলো, 'লা ইয়ুকতালু মু'মিনুন বিকাফিরিন, ওয়ালা যু আহদিন ফি আহদিহী'। উক্ত হাদীসের এই দ্বিতীয় বাক্য 'ওয়া লা যু আহদিন ফী আহদিহী'- এর অর্থকে সুস্পষ্ট করে দেয়; যদি এই হাদীসের অর্থ এটি হয় যে, কোন কাফেরের বিপরীতে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না, তবে 'যু আহদিন'-এর এই অর্থ করতে হবে যে, 'ওয়ালা যু আহদিন বিকাফিরিন', অর্থাৎ, কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকেও কোন কাফেরের বিপরীতে হত্যা করা যাবে না। অথচ এটি কেউ সমর্থন করে না। তাই এখানে কাফেরের অর্থ হলো মুহারিব কাফের, সাধারণ কাফের নয়; অর্থাৎ যুদ্ধরত কাফের, কোন সাধারণ কাফের নয়। এজন্যই বলা হয়েছে, বিধর্মী কাফের প্রজাকেও যুদ্ধরত কাফেরের বিপরীতে হত্যা করা যাবে না।

যদি আমরা সাহাবীদের কর্মপদ্ধতি দেখি তবে আমরা দেখতে পাই, সাহাবীরাও অমুসলিম হন্তারককে মৃত্যুদণ্ডই দিতেন। সুতরাং তাবারীর ইতিহাসে কুমাযবান বিন হরমুযান তার পিতার হত্যার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হরমুযান একজন ইরানী সর্দার ও অগ্নি উপাসক ছিল। আর ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর-এর হত্যার ষড়যন্ত্রে সেও অংশ নিয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়। তখন কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই আবেগের অতিসাহ্যে উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর তাকে খুন করে বসে। তিনি বলেন, ইরানীরা মদীনায় পরস্পর মিলেমিশে থাকতো। স্বভাবতই ভিন দেশে গিয়ে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হয় তাই এক দিন হযরত উমর (রা.)-এর ঘাতক ফিরোজ আমার বাবার সাথে সাক্ষাত করে এবং তার কাছে একটি খঞ্জর ছিল যার উভয় পাশ ছিল ধারালো। আমার বাবা সেই খঞ্জরটি হাতে নেয় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তুমি এ দেশে এই খঞ্জর দিয়ে কী কাজ করো? অর্থাৎ এই দেশ তো শান্তিধাম, এখানে এমন অস্ত্রের কী প্রয়োজন? সে উত্তরে বলে, আমি এটি দিয়ে উট ধাওয়াই। তারা যখন পরস্পর বাক্যালাপ করছিল তখন কেউ একজন তাদের বিষয়টি দেখে। পরবতীতে হযরত উমর (রা.) যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি নিজে হরমুযানকে উক্ত খঞ্জরটি ফিরোজের হাতে তুলে দিতে দেখেছি। হরমুযানের ছেলে বলে, তখন হযরত উমর (রা.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র উবায়দুল্লাহ্ গিয়ে আমার বাবাকে হত্যা করে। (হরমুযানের ছেলে বলে,) হযরত উসমান (রা.) যখন খলীফা হন তখন তিনি আমাকে ডাকেন আর উবায়দুল্লাহ্কে গ্রেফতার করে আমার হাতে তুলে দেন আর বলেন যে, হে আমার পুত্র! এই হল তোমার পিতার হন্তারক আর আমাদের চেয়ে তুমি তাকে হত্যা করার অধিক অধিকার রাখ। তাই তাকে নিয়ে যাও এবং তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কর। আমি তাকে ধরে শহরের বাইরে রওনা হলাম। পথিমধ্যে যার সাথে-ই আমার সাক্ষাত হতো, সে-ই আমার সাথে সাথে চলতে থাকতো কিন্তু আমার সাথে বিবাদে জড়াতো না। তাদের প্রত্যেকে আমার কাছে কেবল এতটুকু মিনতি করছিল যে, তাকে ছেড়ে দাও। অতএব আমি সকল মুসলমানকে উদ্দেশ্য করে বলি যে, তাকে হত্যা করা আমার জন্য বৈধ নয় কি? সবাই বলল, হ্যাঁ তাকে হত্যা করার অধিকার তোমার আছে। অন্যদিকে তারা উবায়দুল্লাহ্কে তার কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করতে লাগলো। এরপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার কি তোমাদের আছে? তারা উত্তরে বলল, অবশ্যই নেই। পুনরায় তারা উবায়দুল্লাহ্কে ভর্ৎসনা করল কেননা সে কোন প্রমাণ ছাড়াই তার পিতাকে হত্যা করেছে। তখন আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকদের মনোস্তুষ্টির জন্য তাকে (তথা উবায়দুল্লাহ্কে) ছেড়ে দিলাম। এত এত লোক যখন তার জন্য সুপারিশ করল, অনেক প্রশ্নোত্তর যখন হয়ে গেল, তিনি বলেন, তখন আমি আল্লাহ্র খাতিরে এবং ঐ লোকদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। তখন মুসলমানরা এতই আনন্দিত হয়েছিল যে, আমাকে কাঁধে তুলে নিল। আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমি আমার ঘর পর্যন্ত মানুষের কাঁধ ও মাথায় চড়ে পৌঁছে গেলাম আর তারা আমাকে মাটিতে পা লাগাতে দেয় নি।এই বর্ণনা দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয় যে, সাহাবীদের কার্যপদ্ধতিও এটিই ছিল যে, তারা অমুসলিমের হাত দিয়ে মুসলিম হন্তারকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেন আর এটিও সাব্যস্ত হয় যে, যে অস্ত্র দ্বারাই কেউ মারা যাক না কেন, সে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পাবে। এমনিভাবে এটিও সাব্যস্ত হয় যে, হন্তারককে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদানের অধিকার কেবল রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে। যদিও এখানে এটিও বর্ণিত আছে যে, সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অমুসলিমও যদি হতো তবুও একটু আগে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো দ্বারা এটিই মনে হয় যে, অমুসলিমের হন্তারকের সাথেও তেমনি আচরণ করা হতো যেরূপ মুসলমানের হন্তারকের সাথে করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে চুক্তি থাকলে তো আর কথাই নেই। এমনিভাবে এটিও প্রতীয়মান হয় যে, হন্তারককে গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদানের অধিকার কেবল রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে। এক্ষেত্রে আইন নিজ হাতে তুলে নেয়ার সুযোগ নেই, রাষ্ট্র এ কাজ করবে কেননা এই রেওয়ায়েত থেকে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, উবায়দুল্লাহ্ বিন উমরকে হযরত উসমান (রা.)-ই গ্রেফতার করান আর তার মৃতুদণ্ড কার্যকর করার জন্য তাকে হরমুযানের পুত্রের হাতে তিনিই তুলে দিয়েছিলেন। হরমুযানের কোন উত্তরাধিকারী তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে নি আর না-ই সে গ্রেফতার করেছিল। হযরত খলীফা সানী (রা.)-এর মতে এস্থলে একটি বিষয়ে সন্দেহ দূর করা আবশ্যক মনে হয় আর তা হলো, ঘাতকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দেয়া উচিত- যেরূপ হযরত উসমান (রা.) করেছিলেন নাকি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার শাস্তি কার্যকর করা উচিত? এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে, এই ঘটনা ছিল ব্যতিক্রম। তাই এটিকে ইসলাম ধর্ম প্রত্যেক যুগের জন্য যেরূপ সমীচীন তদরূপ করার নির্দেশ দিয়েছে। যেকোন জাতি নিজ সংস্কৃতি ও সমাজ অনুযায়ী যেটিকে কল্যানকর মনে করে সেই পন্থাই অবলম্বন করা সমীচীন। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই উভয় পন্থাই বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে উপকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৯-৩৬১)

এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এখন আমি কতক প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং এরপর তাদের গায়েবানা জানাযাও পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ মোকাররমা প্রফেসর সৈয়্যদা নাসীম সাঈদ সাহেবার যিনি মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবের স্ত্রী এবং হযরত আলহাজ্জ হাফেয ডাক্তার সৈয়্যদ শফী সাহেব মুহাক্কেক দেহলভী (রা.)-এর মেয়ে ছিলেন। ৮৮ বছর বয়সে পাকিস্তানে তার ইন্তেকাল হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তার পিতার নাম হযরত আলহাজ্জ হাফেয ডাক্তার সৈয়্যদ শফী আহমদ সাহেব মুহাক্কেক দেহলভী (রা.)। তিনি বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তিনি অতি উত্তম (মুনাযের মুহাক্কেক) বিতার্কিক, গবেষক এবং উন্নত মানের একজন সাহাবী ছিলেন। দিল্লী থেকে ১৬ পত্রিকা তিনি ছেপেছিলেন। হযরত সৈয়্যদ শফী আহমদ সাহেব (রা.) ১২ বছর বয়সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ সূফী, কবি এবং বুযূর্গ খাজা মীর দারদ-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মীর নাসের নওয়াব (রা.)-এর আত্মীয়দের একজন ছিলেন। হযরত সৈয়্যদ শফী আহমদ (রা.) সম্পর্কের দিক থেকে হযরত আম্মাজান (রা.)-এর ভাগনে ছিলেন। ১৯৫৭ সালে লাহোরের ছাউনীর সাব-ইঞ্জিনিয়ার মুকাররম মুহাম্মদ সাঈদ আহমদ সাহেবের সাথে মরহুমার বিয়ে হয়। তার মেয়ে খালেদা সাহেবা বলেন, আমার নানী আমার পিতামাতার বিয়ের সময় তাকওয়াকে অগ্রগণ্য রেখেছেন। তিনি কেবল এটি দেখেছেন, ২২-২৩ বছরের একটি ছেলে জামা'তের এমন নেতা যার সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে সেটি একটি মৃতপ্রায় জামা'ত ছিল যার মাঝে প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে আর এই সেবার জন্য সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য হলেন তাদের কায়েদ মুহাম্মদ সাঈদ আহমদ এবং তার ৪ -৫ জন সহযোগী। অতঃপর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তার মানবসেবার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, গত বছর বন্যায় তিনি অসাধারণ কাজ করেছেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি প্রশংসার যোগ্য। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তার অর্থাৎ সৈয়্যদা নাসীম সাঈদ সাহেবার স্বামীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রেখে নাসীম সাঈদ সাহেবার মা তার সাথে তার বিয়ে করান। সৈয়্যদা নাসীম সাঈদ সাহেবার ৪ পুত্র ও ২ কন্যা রয়েছে। ১৯৫৪ সালে হযরত সৈয়্যদা ছোট আপা (রা.)-এর

সাথে তার ধর্মসেবার যাত্রা আরম্ভ হয়। ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬১ বছর এই সেবা অব্যাহত ছিল। আর যেহেতু সাঈদ সাহেব সেনাবাহিনীতে ছিলেন তাই বিভিন্ন শহরে তার ট্রান্সফার হতে থাকতো। তিনিও তার সাথে বিভিন্ন শহরে যেতেন এবং সেখানে তার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়। তিনি নিজেও অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ও জ্ঞানী মহিলা ছিলেন। তিনি প্রায় ২০টির মত বই লিখেছেন যাতে নবীদের জীবনী রয়েছে। এছাড়া পুণ্যবান বুযুর্গদের বৃত্তান্তমূলক অনেকগুলি পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করেছেন।

তার মেয়ে হামিদা গাফুর মান্নান লিখেন, আমার মা ইবাদতকারী, জ্ঞানের ওপর আমলকারী, নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত, আত্মত্যাগকারী এবং স্নেহ ও ভালবাসার মূর্তমান প্রতীক ছিলেন। সর্বদা তাকে বিগলিত চিত্তে দোয়া করতে দেখেছি। তাহাজ্জুদ, নফল এবং ফরয নামাযেও তাকে রীতিমত আমরা মগ্ন দেখতাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত মোট চারজন খলীফার সাথেই তিনি তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং জামা'তের বিভিন্ন সেবা করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন। আমার সাথে তার কখনো সাক্ষাত হয় নি কিন্তু পত্রযোগে তিনি সবসময় তার ভালবাসা প্রকাশ করতেন। তার সন্তানেরাও একই কথা লিখেছে আর আমিও দেখেছি, যখনই তার পত্র আসতো তাতে অসাধারণ ভালবাসা প্রকাশ পেতো। কেবল কথার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কার্যত দেখতাম যে, খিলাফতের সাথে তার নিষ্ঠা ও ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তার সন্তানসন্ততিকেও আল্লাহ্ তা'লা এই সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

তাঁর বড় পুত্র খালেদ সাঈদ সাহেব বলেন, তিনি আমাদেরকে বলতেন, সদা আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক রাখবে আর এই সুসম্পর্ক যেন এমন হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তোমাদের সম্মুখে বন্ধুর মত অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) -এর সাথে তাঁর সত্যিকার প্রেমবন্ধন ছিল, নিজের তো ছিল-ই সন্তানদেরকেও এ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং জামা'তের সাথে গভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক নিজেও রক্ষা করেছেন এবং সন্তানদেরকেও এ বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। খিলাফতের সাথে নিজেও গভীর সম্পর্ক রক্ষা করেছেন পাশাপাশি আমাদেরকেও শিখিয়েছেন। জামা'তের সেবায় সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। শৈশব থেকেই আমাদেরকে নামায-কালাম এবং ইসলামী শিক্ষার ওপর রীতিমত আমল করার ক্ষেত্রে অভ্যাস গড়ে তুলার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করতেন। পথ চলতে চলতে সৃষ্টির সেবা করতেন এবং বলতেন, মানুষের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি কর। মালি কুরবানির দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মালি কুরবানি করার পরেই সংসারের খরচ নির্বাহ কর। প্রত্যহ কুরআন পাঠ করতেন এবং এবিষয়ে আমাদেরকেও উপদেশ দিতেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে নব আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট ছিল এবং আমাদেরকেও এবিষয়ে উপদেশ দিতেন। দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র (তথা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান) জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। আমাদেরকে বারবার তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের জন্য তাগিদ প্রদান করতেন। জ্ঞানচর্চার বিষয়ে আমাদের উপদেশ প্রদান করতেন আর বলতেন, মুখে সবসময় হাসি রাখবে আর কারো অমঙ্গল কামনা করবে না। তার মাঝে অতিথিপরায়নতা ও অতিথিকে সম্মান করার চারিত্রিক গুণ পরিপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন এবং তাঁর মর্যাদা উচ্চ করুন; তাঁর সন্তানদের মাঝেও এই পুণ্যকর্মগুলো জীবিত রাখুন। তাঁর সন্তানদেরও এই সৎকর্মগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ জার্মানির দাউদ সুলায়মান বাট সাহেবের; যিনি ৪৬ বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن। তাঁর প্রপিতামহ হযরত আব্দুল হাকিম বাট সাহেবের মাধ্যমে তাঁদের বংশে আহমদীয়াতের আগমন ঘটে; যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবৃন্দের মাঝে তাঁর স্ত্রী ছাড়া রয়েছেন এক কন্যা এবং দুই পুত্র। তাঁর স্ত্রী সামীরা দাউদ সাহেবা বলেন, জামা'তের সেবায় তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন আর কিভাবে জামা'তের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা যায়- তিনি সেই চেষ্টাই করতেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন ধর্মকে সংসারের ওপর প্রাধান্য দানকারী একজন ব্যক্তি। পরিচিতজন সবার মত হলো, তাঁর মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকত। তিনি সদকা-খয়রাতের ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রগামী এবং সর্বদা সেবায় প্রস্তুত থাকতেন। এখানে জার্মানীতে বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগে দায়িত্ব পালন করতেন আর তাঁর দলের সদস্যরা লিখেছেন যে, তিনি স্বানন্দে এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ব সহকারে কাজ করতেন এবং তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি প্রতিটি কাজ আরম্ভ করার পূর্বে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমিও এটি লক্ষ্য করেছি, তিনি সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লাহ্ তা'লার তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ধৈর্য্য ও সাহসিকতা দান করুন এবং সন্তানদের তাঁর সৎকর্মগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ গোলাম মুস্তফা আওয়ান সাহেবের স্ত্রী সিয়ালকোট নিবাসী যাহেদ পারভীন সাহেবার; যিনি ৬১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن। তাঁর কন্যা হেবাতুল কালিম সাহেবা; তাঁর পুত্র রাশিয়ার বুশক্রিস্তানে কর্মরত আমাদের মুবাল্লেগ জামিল তাবাসসুম সাহেব বলেন, আমার মা আল্লাহ্‌র ফযলে জন্মসূত্রেই আহমদী ছিলেন, তিনি মূসীয়া ছিলেন। তার মা এবং পিতার দাদা দিওয়ান বখশ্ সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াতসূচিত হয়। তিনি বলেন, সাবালক হওয়ার পর থেকে আমি মাকে কখনো তাহাজ্জুদের নামায বাদ দিতে দেখি নি আর সন্তানদেরও সবসময় নসীহত করতেন যে, জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক বজায় রেখ। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের মাঝে রয়েছে এক পুত্র ও চার কন্যা। তাঁর তিনজন জামাতা ওয়াকফে জীন্দেগী এবং দুই কন্যার মুবাল্লেগের সাথে বিয়ে হয়েছে। নিজেদের পরিবারের সাথে দেশের বাইরে ছিলেন একারণে শেষ সময় নিজ মায়ের কাছে আসতে পারেননি, দেখতে পারেননি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার সন্তানাদিকে তার পুণ্যকর্মগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ লন্ডনের রানা আব্দুল ওহীদ সাহেবের যিনি ফয়সালাবাদ জেলার জারনাওয়ালার তহসীল চৌধুরী আব্দুল হাই সাহেব এর পুত্র ছিলেন। তিনিও ২৬জুন হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن । আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন এবং আনসারুল্লাহ্ সংগঠনে তিনি অনেক পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন। অধিকন্তু মসজিদ ফজলের সেক্রেটারী যিয়াফত এবং সেক্রেটারী মাল হিসেবে সেবা দান করে আসছিলেন। অনেক পরিশ্রমি কর্মী ছিলেন এবং স্বানন্দে সকল সেবা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরকে ধৈর্য্য ও সাহস সঞ্চার করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ বাংলাদেশ জামা'তের সাবেক আমীর মুহাম্মদ আলী সাহেবের। তিনি ৮৪বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن। তিনি কেন্দ্রীয় এবং দেশীয় জামা'তে বেশ কয়েকটি দায়িত্বে সফল ছিলেন। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর হিসেবে খেদমত করার তৌফিক পেয়েছেন। এছাড়াও সেক্রেটারী রিশতানাতা ও সেক্রেটারী তবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৩ সাল থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত ঢাকা জামা'তের আমীর হিসেবে সেবা করে যাচ্ছিলেন। তার ইমারতের যুগে বাংলাদেশ জামা'ত অনেক উন্নতি করেছে। বিশেষভাবে জামা'তের জায়েদাদ বিভাগ ও ভবন নির্মাণের অনেক কাজ হয়েছে। কেন্দ্রীয় মিশন হাউজও তিনি নির্মাণ করান। অনুরূপভাবে অনেক মসজিদও নির্মান করিয়েছেন। অনেক পুণ্যবান, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, তাহাজ্জুদগুযার, সহানভুতিশীল, দোয়াকারী, মালী কুরবানীতে অধিক অগ্রসরমান ছিলেন। দরিদ্রদের প্র তি খুবই যত্নশীল এবং মানুষের উপকারী সত্তা ছিলেন। খিলাফত প্রেমিক এবং জামা'তের কর্মঠ কর্মী ছিলেন। উত্তরাধিকারীদের মাঝে দুই পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্যকর্মগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর তাদের সকলের জানাযা গায়েব আমি পড়াবো।

****

১ম পাতার শেষাংশ

ফিরিশতাদের কথা বলছ! এর বাণীর এমনই মহিমা যে আমরা নিজেরাই এসে দেখব যে কে এই বাণীর মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হস্তক্ষেপ করে? এর অর্থ এই নয় যে, ফিরিশতাগণ কুরআন করীমকে রক্ষা করে না। কেননা খোদা স্বয়ং প্রভু যেহেতু রক্ষা করেন, অতএব ফিরিশতা তা প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে পালন করবে। কিন্তু 'ইন্না লাহু লাহাফিজুন' বলার মাধ্যমে একটি অতিরিক্ত কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এরমধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যা যা ফিরিশতারাও রক্ষা করতে পারবে না, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সেগুলিকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তুকে ফিরিশতা রক্ষা করে, কিন্তু খোদা তা'লার স্বয়ং তা রক্ষার মধ্যে একটি প্রজ্ঞা নিহিত আছে আর কুরআন মজীদকে সাধারণ বিষয়ের থেকে অনন্য মর্যাদা দান করার মধ্যে পার্থক্য আছে।

(তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৪)

সৈয়্যদানা হযরত আল মুসলেহ মওউদ খলীফাতুল মসীহ (রা.) বলেন:

"যে ব্যক্তি হিদায়াত অন্বেষণকারী, আমার মতে, সে যেন যাবতীয় বিদ্বেষ ও ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে খোদার নিকট দোয়া করে যে, হে খোদা! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ , তুমি সকল সত্যের উৎস, তুমিই প্রকৃত পথপ্রদর্শক। অতএব, তুমি আমাকে সত্যের পথ দেখাও।' যদি কোন ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই পদ্ধতি অবলম্বন করে, আমার বিশ্বাস, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তার পথপ্রদর্শনের জন্য উপকরণ সৃষ্টি করবেন। এটি এমন এক পন্থা যার দ্বারা ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে।" (আল ফযল, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৯)

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

এরপর ডক্টর মাইকেল উইলকি নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি ওয়ান্ডশাট টিনজেন কাউন্টির লোরাহ টিনজেন টাউনের মেয়র। তিনি বলেন: মহাসম্মানীয় খলীফাতুল মসীহ! আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি আপনার আমন্ত্রণ সানন্দে স্বীকার করেছি। কেননা আমি আপনাকে আগে থেকেই জানতাম। এখানে ইসলামের প্রতি এক প্রকারের ভীতি রয়েছে, কেননা, প্রায় প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, যেমন- বার্লিন, স্টকহোম, লন্ডন ও প্যারিসে মুষ্টিমেয় মানুষ ইসলামের নামে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। এই কারণেই ভীতির সঞ্চার হয়েছে যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মেছে। এর একমাত্র প্রতিকার হল পারস্পরিক অজ্ঞানতা দূর করে নিজেদের মধ্যে পরিচিতি ও সম্পর্ক গড়ে তোলা। পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা দরকার যাতে পরিচিতি বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, দুই বছর পূর্বে জামাতের সদস্যরা আমার কাছে এসে প্রস্তাব দেয় যে, যেভাবে জার্মানীর অন্যান্য অঞ্চলে নতুন বছরের সূচনায় তাদের সম্প্রদায় শহর পরিস্কার করে, অনুরূপভাবে তারাও নিজের শহরও পরিস্কার করতে চায় যাতে তারা সমাজে নিজেদের ভূমিকা রাখতে পারে। আমি এ বিষয়ে জামাতের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটি ভীতিপূর্ণ পরিবেশকে সংশোধন করার জন্য আরও অনেক কিছু করতে হবে। আমি এ বিষয়ে গর্বিত যে, আমি এমন এক শহরের মেয়র যেখানে ১১২ টি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। ১০ বছর থেকে আমরা মুসলমান ভাইদের জন্য রমযানের ইফতারী অনুষ্ঠানও করে আসছি যা এই ভীতি দূর করার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ। তিনি বলেন, আমি আপনাদেরকেও বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যাতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন তৈরী হয় এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামের শান্তির বাণীর প্রসার করি। এখন আপনাদের নতুন জীবন এই মসজিদের সঙ্গে আরম্ভ হতে যাচ্ছে। আমাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই।

*এরপর টিনজেন শহরের প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের পাদরী স্টকবার্গার নিজের বক্তব্যে বলেন: সর্ব প্রথম আমি হুযুর আনোয়ার (আই.) এবং অন্যান্য অতিথিবর্গকে স্বাগত জানাই। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব মতবাদ ও ঐতিহ্য রয়েছে। প্রত্যেকের পবিত্র তীর্থস্থান, উৎসব এবং পবিত্র মনিষী রয়েছে। অনুরূপভাবে সমস্ত ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন প্রথা ও আচারানুষ্ঠানও পাওয়া যায়। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সকলে ঐক্যমত যে খোদা তা'লা এক ও অ-দ্বিতীয়। এই মতবাদে ইউরোপের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাসী, কিন্তু আপনি যদি কোন হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেন তখন এক খোদার মতবাদ উপস্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়বে। এর সমাধান হল এই যে, সত্য ধর্মের স্বরূপ নিজে থেকেই প্রকাশ পেতে থাকবে এবং সফলতা অর্জন করতে থাকবে। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। অতএব সত্য সবসময় সফলতা অর্জন করবে। সত্যের সফলতা এবং বিজয়ের ভিত্তি হবে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা। প্রেম-ভালবাসা যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই সফলতা অর্জন করে। আমরা যদি প্রেম-প্রীতির প্রসার করতে চাই তবে আমাদেরকে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে হবে। বিভিন্ন মতবাদ যেগুলি শান্তি-ভিত্তিক সেগুলির ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত নয়। আমাদের সকলের নিজের নিজের ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সহাবস্থান করা অবশ্যই সম্ভব, এ বিষয়ে আমাদের লড়াই করার করার কোন প্রয়োজন নেই। মানুষ অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে অনেক সময় ভীত-সন্ত্রস্ত হয় ঠিকই, কিন্তু যদি পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বজায় থাকে ও সম্পর্ক গড়ে ওঠে তবে সেই ভীতি অবশিষ্ট থাকে না।

তিনি সবশেষে বলেন, আমি এবিষয়টি পুনরায় স্পষ্ট করতে চাই যে, আমাদেরকে এই বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, আমরা সকলে এক খোদার সন্তান এবং একই পরিবারের সদস্য। এই পরিবারের একটি আইন বলবৎ আছে। এই আইনে প্রত্যেকের জন্য এই অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে যে মানুষকে নিজস্ব ধর্ম-বিশ্বাস রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মানুষকে আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রদান করা একটি মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়। এইভাবেই আমরা জার্মানীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকতে পারি। আমাদের জন্য একত্রে থাকার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হওয়া উচিত নয়। আর বিশেষ করে আপনাদের জামাতের যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে তা এমন প্রকারের যেগুলিতে আমরা খৃষ্টান হিসেবে ভালভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারি। এ বিষয়টি নিয়ে আমি যারপরনায় আনন্দিত। আমি আশা করি পারস্পরিক প্রেম-প্রীতিই আমাদেরকে ভবিষ্যতে আরও বেশি করে একত্রে বসবাস করার সুযোগ করে দিবে। আমি আমীর সাহেবের বক্তব্যে শুনেছি যে, আপনাদের জামাত অন্যান্য দেশে খৃষ্টানদেরকেও উপাসনাগারের সুযোগ করে দেয়। এটি তো খুবই ভাল কাজ। এইভাবে একত্রে থাকা অবশ্যই সম্ভব। প্রেম-প্রীতির মাধ্যমেই মিলেমিশে থাকা যায়। আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং পাদ্রী হিসেবে আমাকে এখানে বক্তব্য রাখতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষন দান করেন।

হুযুরের ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া পাঠের পর বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। যে আয়াতটি তিলাওয়াত করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এবং কয়েকজন বক্তার কথার উপর কয়েকটি বিষয় নোট করেছিলাম। কিন্তু আমি মিঃ স্টকবার্গার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞ যিনি একজন পাদ্রী। তিনি আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। শান্তি এবং ধর্মের বিষয়ে আরও অনেক যে সব কথা আমার বলার ছিল তা তিনি আমার পক্ষ থেকে বলে দিয়েছেন। এইজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

যাইহোক, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম হওয়া সত্বেও যদি একত্রে মিলেমিশে থাকা যায় তবে এটি খুব ভাল কথা। এই কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা খৃষ্টান ও ইহুদী উভয়কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে, এস! আমরা সেই বিষয়ে ঐক্যমত হই, সেই কলেমা বা বাণীর উপর ঐক্যবদ্ধ হই যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অভিন্ন আর সেই অভিন্ন কলেমা হল আল্লাহ্ তা'লার সত্তা।

এখানে একটি বিষয়ে আমি দ্বিমত পোষণ করব। তিনি বলেছেন, হিন্দুরা এক খোদায় বিশ্বাসী নয়। বস্তুতঃ হিন্দুরাও তাদের নানান দেবতা থাকা সত্বেও শেষ পর্যন্ত তারাও এক খোদা পর্যন্ত পৌঁছায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সমস্ত ধর্ম আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এসেছে এবং সেগুলি এসেছে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য, ভিন্ন ভিন্ন যুগে। যদি সমস্ত ধর্মই খোদার পক্ষ থেকে এসে থাকে এবং সেই খোদার পক্ষ থেকে এসে থাকে যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জীব করেছেন, তবে বাণীও একটিই হওয়া উচিত ছিল। আর সেই বাণী একটিই ছিল- অর্থাৎ খোদার উপাসনা কর, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে জীবন যাপন কর। এই কারণেই আমরা, যারা প্রকৃত মুসলমান, সমস্ত আম্বিয়াগণের উপর বিশ্বাস রাখি। আমরা এই বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, প্রত্যেক জাতিতে এবং প্রত্যেক ধর্মে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আম্বিয়া, প্রত্যাদিষ্ট ও পুণ্যবান পুরুষগণ আবির্ভূত হয়েছেন যারা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অতএব যখন সমস্ত ধর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের এমন কোন অধিকার নেই যে, তোমরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে এবং বিবাদে লিপ্ত হবে বরং কুরআন শরীফকে যদি গভীর মনোযোগের সহকারে পাঠ কর তবে দেখবে আঁ হযরত (সা.) কে যে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার কারণ ছিল মুসলমানদের উপর দীর্ঘ সময় যাবৎ নিপীড়ন ও নির্যাতন যার ফলে তিনি (সা.) দেশ ত্যাগ করে মদিনা হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর অনুমতি প্রসঙ্গে কুরআন করীমে যে আয়াত রয়েছে সেখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় লেখা আছে যে, যদি তোমরা অত্যাচারীর হাত প্রতিহত না কর, তবে এই অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সেই কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। কুরআন করীমে একথা লেখা আছে যে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া এজন্য আবশ্যক যে, যদি তাদেরকে প্রতিহত না করা হয় তবে কোন গীর্জা অবশিষ্ট থাকবে না, কোন সেনাগউজ কিম্বা কোন মন্দির বা মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, যেখানে মানুষ উপসনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়।

অতএব একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য জরুরী হল যখন সে নিজের মসজিদের সুরক্ষা করতে চাই, তখন তার কর্তব্য হবে গীর্জার ও মন্দিরের সুরক্ষাও সুনিশ্চিত করা এবং তাদের সঙ্গে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সহকারে মিলেমিশে থাকা। এই শিক্ষাকে যদি মেনে চলা হয় তবেই প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটবে।

আমাদের সামনে কুরআন করীমের যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে তার সারমর্ম হল মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা, দরিদ্র, অনাথ এবং মুসাফিরদের ন্যায্য অধিকার

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin, Neogir hat, (South 24 PGS)

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে। (৫ম পর্ব)

প্রশ্ন: ২০২০ তারিখের ৩১ শে অক্টোবর তারিখের একটি সাক্ষাত অনুষ্ঠানে জামেয়া আহমদীয়ার একজন ছাত্র প্রশ্ন করেন যে, আমরা ইনশাআল্লাহ্ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চলেছি। সেখানে পৌঁছে একজন মুরুব্বীর সর্বপ্রথম কাজ কি হওয়া বাঞ্ছনীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সেখানে পৌঁছে প্রথমে দোয়া করুন যে, 'আল্লাহ্ তা'লা এই স্থানে যেখানে আমার পোস্টিং হয়েছে, আমাকে সঠিকভাবে সততা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্তার সঙ্গে কাজ করার তৌফিক দিন। দোয়া করুন এবং সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটান। সব সময় মনে রাখবেন, আমাদের কাজ দোয়ার মাধ্যমে হয়। তাই প্রত্যেক মুবাল্লিগ ও মুরুব্বী যখন কর্মক্ষেত্রে যায় তখন তাদের অঙ্গীকার করা উচিত যে আজকের পর কখনও তাহাজ্জুদের নামায ত্যাগ করব না, নিয়মিত পড়ব। আপনাদের মধ্যে অনেক মুবাল্লিগ যারা মারা যান, যাদের জীবনি কিছু ঘটনা আমি তুলে ধরি, সেখানে আমি একথা বর্ণনা করি যে তারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। প্রত্যেক মুরুব্বীকে প্রত্যহ অন্তত এক ঘন্টা করে তাহাজ্জুদ পড়া উচিত। সেই নামাযে দোয়া করা করা উচিত যে, আল্লাহ্ যেন আপনাদের কাজে বরকত দান করেন। এছাড়া পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ক্ষেত্রে আপনি সেন্টার কিম্বা মসজিদ থাকলে সেখানে গিয়ে পাঁচ বেলা নামায পড়ুন। এছাড়া প্রত্যেক আহমদীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক তৈরী করুন। আহমদীদের মাঝে যদি মনমালিন্য থাকে, তা আপনাকে দূর করতে হবে। লোকদের বোঝাবেন যে আমরা মোমেন, আর মোমেনরা পরস্পর ভাইভাই। সেই সব স্থানে আহমদীদেরকে মিলে মিশে থাকার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কোন প্রকার মানমালিন্য থাকলে তা দূর করবেন। প্রত্যেকের সঙ্গে যেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে আর লোকেরাও যেন আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতে উৎসুক থাকে, আপনাকে ভালবাসে। এরফলে তারা আপনার কথা শুনবে। অনুরূপভাবে যুগ খলীফার সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক রাখবেন। মাসিক রিপোর্ট পাঠানোর পাশাপাশি প্রতি মাসে আমার কাছে একটি করে চিঠি লিখবেন যাতে বোঝা যায় যে মুরুব্বী সাহেব কেমন কাজ করছেন। আর মানুষকেও এই কাজে উৎসাহ দিবেন, যুগ খলীফার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক রাখা জরুরী তা তাদেরকে বোঝাবেন। যেদিন থেকে এখানে ইন্ডোনেশিয়ান ডেস্ক শুরু হয়েছে, তখন থেকে অনেক মানুষ আমাকে চিঠি লেখে, যা অনুবাদ হয়ে আমার কাছে আসে। এবিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যে তারাও যেন যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, প্রতি সপ্তাহের খুতবা নিয়মিত শোনে এবং তাতে যে সব উপদেশ ও নির্দেশমূলক কথা থাকে তারা যেন সেগুলি মেনে চলার চেষ্টা করে। সর্বপ্রথম মুরুব্বী সাহেব নিজে, পরে সাধারণ মানুষ। ঠিক আছে!

জনৈক ব্যক্তি হুযুর আনোয়ারকে লেখেন, 'আমি একথা জেনে ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছি যে ইসলাম যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের বন্দী হওয়া মহিলাদের সঙ্গে সহবাস করার এবং তাদেরকে বিক্রি করে দেওয়ার অনুমতি দেয়। এ বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক। এছাড়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়াতের পর আমার আশা ছিল যে, তিনি এ বিষয়টিকে খণ্ডন করবেন এবং ঘোষণা দিবেন ইসলাম এমন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত। কিন্তু আমি এমনটি হতে দেখি নি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৮ সালের ৩রা মার্চ তারিখে লেখা চিঠিতে এর উত্তরে বলেন-

'আসলে এই বিষয়টি ভালভাবে স্পষ্ট না হওয়ার কারণে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে এই সব বিভ্রান্তির অপনোদন করেছেন, আর তাঁর খলীফাগণও বিভিন্ন সময় প্রয়োজন অনুসারে বিষয়টির অপনোদন করে এসেছেন এবং প্রকৃত শিক্ষা বর্ণনা করেছেন।

প্রথম কথা হল মহিলাগুলি যেহেতু শত্রুপক্ষের কেবল এই কারণেই তাদের বন্দী করে নিয়ে এসে দাসী বানিয়ে নাও- ইসলাম কখনই এর অনুমতি দেয় না।

ইসলামের শিক্ষা হল যতক্ষণ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না হয়,ততক্ষণ কাউকে বন্দী বানানো যাবে না। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنۡ يَّكُوۡنَ لَهٗۤ اَسۡرٰى حَتّٰى يُثۡخِنَ فِى الۡاَرۡضِ ؕ تُرِيۡدُوۡنَ عَرَضَ الدُّنۡيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيۡدُ الۡاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ

কোন নবীর পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, সে কোন যুদ্ধ-বন্দী রাখে যদি না সে দেশে নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (যদি তোমরা নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ব্যতিরেকে যুদ্ধ বন্দী রাখ সেক্ষেত্রে) তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করিতেছ (বলিয়া সাব্যস্ত হইবে) এবং আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকাল চাহিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

(আনফাল:৬৮)

কাজেই যেখানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শর্ত প্রযুক্ত হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে কেবল সেই সব মহিলাদেরকেই কয়েদী হিসেবে ধরে নিয়ে আসা হত যারা যারা যুদ্ধের জন্য সেখানে উপস্থিত থাকত। তাই তারা কেবল মহিলাই ছিল না, যুদ্ধের প্রতিপক্ষ হিসেবে সেখানে তারা আসত।

এছাড়াও তৎকালীন যুগের যুদ্ধের নিয়মাবলী অনুধাবন করলে জানা যাবে যে যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষই প্রতিপক্ষের পুরুষ, মহিলা কিম্বা শিশুকে কয়েদী হিসেবে দাস বা দাসী বানিয়ে নেওয়ার প্রথা ছিল। তাই وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثۡلُهَا এই আয়াতের অধীনে মুসলমানদের এমন কাজ মোটেই আপত্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় না, যখন কি না তা তাদের নিজেদেরই নিয়ম অনুসারে উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণীয় ছিল এবং বিশেষ করে যখন সেটিকে সেই যুগ, পরিবেশ এবং অঞ্চলের নিয়মকানুনের প্রেক্ষাপটে দেখা হয়। সেই যুগে যুযুধান দুই পক্ষ প্রচলিত নিয়ম ও প্রথা অনুসারেই যুদ্ধ করত আর যুদ্ধের যাবতীয় নিয়মকানুন উভয় পক্ষের জন্যই প্রযোজ্য হত, এতে কোন পক্ষই আপত্তি থাকত না। এ বিষয়টি আপত্তিকর তখনই হত যখন মুসলমানেরা এই সর্বস্বীকৃত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে এই কাজ করত।

এতদ্সত্ত্বেও কুরআন করীম একটি নীতিগত শিক্ষার মাধ্যমে যুদ্ধের সমস্ত নিয়মগুলিকেও বেঁধে দিয়েছে। কুরআন করীমে বলা হয়েছে-

فَاعۡتَدُوۡا عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا اعۡتَدٰى عَلَيۡكُمۡ

অর্থাৎ কেহ যদি তোমাদের প্রতি অন্যায় করে, তাহা হইলে যে তোমাদের প্রতি যে পরিমাণ অন্যায় করিবে তোমরাও তাহাকে সেই পরিমাণ অন্যায়ের শাস্তি দিবে।

(আল বাকারা: ১৯৫)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- 'এরপর যে সীমা লঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।' (আল মায়েদা: ৯৫)

এটি সেই নীতিগত শিক্ষা যা পূর্ববর্তী সকল ধর্মীয়গ্রন্থের শিক্ষামালার উপরও শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে বিদ্যমান যুদ্ধ বিষয়ক শিক্ষা অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে সেগুলিতে শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার শিক্ষা রয়েছে। মহিলা ও পুরুষদের কথা না হয় বাদই দিলাম, তাদের শিশু, জন্তু জানোয়ার এবং ঘরবাড়ি পর্যন্ত লুঠ করে নেওয়ার এবং পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে উভয় পক্ষের ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণে থাকে না এবং একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তারা এতটাই উত্তেজিত থাকে যে হত্যা করার পরও তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হয় না, শত্রুপক্ষের নিহত সৈন্যদের মরদেহ বিকৃত করে ক্রোধ শান্ত করা হয়, এই পরিস্থিতিতেও কুরআনের এমন শিক্ষা উপস্থাপন এক প্রবল উন্মত্ত ঘোড়াকে লাগাম পরানো নামান্তর। আর সাহাবারা সেই শিক্ষা শিরোধার্য করে দেখিয়েছেন, ইতিহাসের শত শত পৃষ্ঠা এমন ঈর্ষনীয় ঘটনায় পূর্ণ হয়ে আছে।

সেই যুগে কাফেররা মুসলমান মহিলাদেরকে কয়েদী বানিয়ে আনার পর তাদের প্রতি অত্যন্ত অশোভনীয় আচরণ করত। শুধু কি কয়েদী? তারা মুসলমান নিহত সেনাদের মরদেহের অঙ্গ বিকৃতি ঘটাত, তাদের নাক-কান কেটে ফেলত। হিন্দা দ্বারা হযরত হামযা (রা.)-এর কলেজা চিবিয়ে খাওয়ার ঘটনা কে ভুলতে পারে? কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যদিও তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছে, তবুও কোনও মহিলা বা শিশুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না, আর অঙ্গ বিকৃত করা থেকে সম্পূর্ণ বারণ করে শত্রুদের মরদেহওর সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছে।

যতদূর দাসীদের প্রশ্ন, এ প্রসঙ্গে সব সময় একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে শত্রুরা যখন মুসলমানদেরকে নানান প্রকারের যাতনা দিত আর যদি কোন অভাবক্লীষ্ট মুসলমান মহিলা তাদের হাতে পড়ত, তবে সেই মহিলাকে

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : **Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)**

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

তারা দাসী বানিয়ে স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিত। কাজেই, 'জাযাউস সাইয়াতিন সাইয়েয়াতুন মিসলুহা'- কুরানের এই শিক্ষা অনুযায়ী যে সব মহিলারা ইসলামের উপর আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাদের সাহায্যার্থে আসত, সেই যুগের প্রথা অনুসারে তাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে দাসী বানিয়ে নেওয়া হত। এরপর শত্রুপক্ষের এই মহিলারা যখন মুক্তিপণ বা চুক্তির মাধ্যমেও স্বাধীন হত না, তখন এমন মহিলাদের সঙ্গে নিকাহর পর্ই সহবাস করা যেত। কিন্তু এই নিকাহর জন্য সেই দাসীর সম্মতির প্রয়োজন হত না। অনুরূপভাবে এমন দাসীদেরকে নিকাহ করলে পুরুষদের চারটি বিয়ে করার অনুমতিতে কোন প্রভাব পড়ত না। অর্থাৎ একজন পুরুষ চারটি বিয়ে করার পরও উপরোক্ত প্রকারের দাসীদেরকে নিকাহ করতে পারত। কিন্তু সেই দাসীর যদি কোন সন্তান হত তবে সন্তানের মা হিসেবে তাদের মুক্ত করে দেওয়া হত।

এছাড়া ইসলাম দাসীদের প্রতি উত্তম আচরণ, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করার এবং তাদেরকে স্বাধীন করে দেওয়াকে পুণ্যের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। হযরত আবু মুসা আশআরীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির কাছে দাসী আছে এবং সে তাকে উৎকৃষ্ট মানের শিষ্টাচার শেখায় এবং তাকে মুক্ত করে দেওয়ার পর তাকে বিয়ে করে, তবে সে দ্বিগুন পুণ্য লাভ করবে।

রওফী বিন সাবিত আনসারি-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে হুনাইনের দিন একথা বলতে শুনেছি , যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে, তার জন্য নিজের পানি অপরের ক্ষেতে দেওয়া বৈধ নয়। অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলাদের সঙ্গে সহবাস করা (বৈধ নয়) । এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে তার জন্য কয়েদী মহিলাদের সঙ্গে সহবাস করা বৈধ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার গর্ভ মুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে, তার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণের পূর্বেই বিক্রি করে দেওয়া বৈধ নয়।

কাজেই যুক্তির কথা হল এই যে, ইসলাম দাসী ও দাস বানানোর পক্ষে মোটেই পক্ষপাতী নয়। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে, সেই সময়ের বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে এর অস্থায়ী অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে তাদেরকেও স্বাধীন করতে উৎসাহিত করেছেন এবং যতদিন পর্যন্ত তারা নিজেদেরকে মুক্ত করত বা তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হত, তাদের সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আর বিশেষ পরিস্থিতির অবসান হতেই যখন রাষ্ট্রীয় আইন নতুন রূপ পরিগ্রহ করল, যেমনটি আজকের যুগে প্রচলিত, তখন সেই সাথে দাস বা দাসী বানানোর বৈধতাও বিলুপ্ত হল। এখন ইসলামী বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে দাস বা দাসী রাখার মোটেই কোন বৈধতা নেই। বস্তুত এ যুগের ন্যায়বিচারক ও মীমাসংসাকারী হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বর্তমান যুগে এটি হারাম বা অবৈধ আখ্যায়িত করেছেন।

এক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারকে পত্র মারফত লেখেন, 'আমরা যখন বলি, কারো নজর লেগেছে বা অত্যাচারিতের অভিশাপের কারণে এই কষ্ট হচ্ছে, তখন এই চিন্তাধারা কি শিরক-এর পর্যায়ভুক্ত?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৮ সালের ৭ই মার্চ তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে বলেন-

নজর লাগা বা নিপীড়িতের অভিশাপের প্রভাব-এগুলির সঙ্গে শিরকে কোন সম্পর্ক নেই। কেননা উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এর পরিণাম বের করেন, দৃষ্টি নিক্ষেপকারী বা অভিশাপদাতা নিজে থেকে কিছু করে না। যে নজর দেয়, তার পক্ষ থেকে এক অনভিপ্রেত বাসনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, কিম্বা নিপীড়িতের যন্ত্রনা থেকে একটি আর্তনাদ ধ্বনিত হয় যা আল্লাহ্ গ্রহণ করে পরিণাম প্রকাশ করেন। কাজেই উভয় বিষয়ের সঙ্গেই শিরকের কোন সম্পর্ক নেই। বিশেষ করে যখন কিনা দুটি বিষয়ই হাদীস থেকে প্রমাণিত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- ' অত্যাচারিতের অভিশাপকে ভয় কর, কারণ তার অভিশাপ এবং আল্লাহ্ তা'লার মাঝে কোন অন্তরায় থাকে না। অনুরূপভাবে হুযুর (সা.) বলেছেন, 'নজর লাগা সত্য, এছাড়াও তিনি শরীরে উলকি দিতে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন: মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাষ্ট্র-এর পক্ষ থেকে প্রস্তুত তরবীয়তীয় বিষয়াদি সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর সংবলিত তথ্যে একটি প্রশ্ন আছে যে আহমদীয়াতের বিজয় হলে পৃথিবীর পৃথিবীর রাজনীতিক পরিবেশ কেমন হবে? এর সম্পর্কে দিকনির্দেশনা করতে হুযুর আনোয়ার ২০১৮ সালের ২৬ শে মে তারিখে চিঠিতে বলেন-

সূরা হুজরাতে আল্লাহ্ তা'লা মোমেনীনদের দুটি দেশের মাঝে যুদ্ধ হলে অন্যদেরকে তাদের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দেওয়ার যে আদেশ দিয়েছেন, বস্তুত সেখানে এই ভবিষ্যদ্বাণীও নিহিত আছে যে যখন সারা বিশ্বে ইসলামের আধিপত্য হবে সেই সময় পৃথিবীতে কেবল একটি মাত্র দেশ থাকবে না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ থাকবে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যেদিন আহমদীয়াতের বিজয় হবে সেদিন যদিও রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশ থাকবে, যাদের দেশীয় আইন ইসলামি আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না। কিন্তু সেই যুগে রাজনীতি এবং আধ্যাত্মিকতা, এই দুটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হবে। প্রকৃত ইসলামী খিলাফত সারা পৃথিবীতে একটি থাকবে আর সমস্ত দেশ আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের বিষয়ে যুগ খলীফার কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিবে। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক বিষয়াদিতে যুগ খলীফা হস্তক্ষেপ করবে না। আর কোন খলীফা নিজে সেনাবাহিনী নিয়ে কোন দেশের উপর আক্রমণ করবে না।

প্রশ্ন: তফসীরে কবীরে দাসীদের বিষয়টি নিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যে অবস্থান নিয়েছেন তার উল্লেখ করে এক ভদ্রমহিলা বিষয়টির উপর আরও আলোচনা করার আবেদন করেছেন। এছাড়াও তিনি পাকিস্তানের লাজনা ইমাউল্লাহ্র শিক্ষা বিষয়ক একটি র‍্যালি উপলক্ষ্যে প্রদর্শিত একটি তথ্যচিত্রে এক=দেড় মিনিট মিউজিক বাজার অভিযোগও করেছেন। (প্রশ্নটির একাংশ এই পর্বের প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় পুনঃপ্রকাশিত হল)

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৮ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন=

'দাসীদের সঙ্গে নিকাহর বিষয়ে আপনার অবস্থান তফসীরে কবীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর ব্যাখা অনুযায়ী একেবারে সঠিক। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়ালও (রা.)-এর এই একই অবস্থান ছিল। অর্থাৎ দাসীদের সঙ্গে নিকাহ করা আবশ্যক।

কুরআন করীম এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর নির্দেশের আলোকে আমিও একথাই মনে করি যে, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে শত্রুরা যখন ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নানান প্রকারের যাতনা দিচ্ছিল, আর যদি কোন দরিদ্র ও অত্যাচারিত মুসলিম মহিলা তাদের হাতে আসত, তবে তারা তাকে দাসী হিসেবে নিজেদের স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিত। ..... কুরআন করীমের এই শিক্ষা অনুসারে যে সব মহিলারা ইসলামের উপর আক্রমণকারী সৈন্যদের সঙ্গে তাদের সাহায্যার্থে আসত, সেই যুগের প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধে তাদেরকে দাসী হিসেবে বন্দী করে নেওয়া হত। শত্রুপক্ষের এই মহিলারা যখন মুক্তিপণ অথবা চুক্তির মাধ্যমেও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত না, তখন এমন মহিলাদের সঙ্গে নিকাহর পর সহবাস করা যেতে পারত। কিন্তু এই নিকাহর জন্য সেই মহিলার সম্মতির প্রয়োজন হত না। অনুরূপভাবে এমন দাসীদের সঙ্গে নিকাহ করার ফলে পুরুষদের চারটি বিয়ে করার অনুমতিতে কোন তারতম্য ঘটত না। অর্থাৎ একজন পুরুষ চারটি বিয়ের পরও উল্লেখিত দাসীদের সঙ্গে নিকাহ করতে পারত। কিন্তু যদি সেই দাসীদের কোন সন্তান জন্ম নিত, সেক্ষেত্রে সন্তানের মা হিসেবে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হত।

শত্রুবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত মহিলারা যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে আসত আর সেই যুগের প্রথামত তারা মুসলমানদের হাতে দাসী হয়ে আসত, তখন তাদের সঙ্গে সহবাসের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন নিকাহর প্রয়োজন নেই= এমন দৃষ্টিভঙ্গিও ভুল নয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) অন্যান্য কিছু স্থানে এমন দাসীদের বিষয়ে উত্তর দিতে গিয়ে এই মতও ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) ও মজলিসে ইরফানের কয়েকটি অনুষ্ঠানে এবং দরসুল কুরআনে দাসীদের বিষয়ে তফসীর করতে গিয়ে একই মত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ এই সব দাসীদের সঙ্গে সহবাসের জন্য আনুষ্ঠানিক কোন নিকাহর প্রয়োজন হয় না।

এখানে এ বিষয়টিও বর্ণনা করা সমীচীন বলে মনে করি যে, কুরআন করীমে বর্ণিত এমন সব অতীতের বিষয়াদির ব্যাখ্যা নিয়ে খলীফাগণের মাঝে মতানৈক্য হওয়াও আপত্তির বিষয় নয়, এগুলি প্রত্যেক খলীফার কুরআন সম্পর্কে বোধগম্যতার পরিচায়ক আর খলীফাদের মাঝে এমন মতবিরোধ বৈধ।

যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি যে, এ বিষয়ে আমার মত এটিই যে, শত্রুপক্ষের এমন মহিলাদের সঙ্গে সহবাসের জন্য নিকাহর প্রয়োজন হত আর আমার এই সময়কালে এটি জামাতের অবস্থান হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু এটাও সম্ভব যে, আমার পরে আগমণকারী খলীফা আমার এই অবস্থানের বিপক্ষে মত দিতেও পারে। যদি এমনটি হয়, তবে সেই সময় সেটিই জামাতের অবস্থান হিবে বিবেচিত হবে যা সেই সময়ের খলীফার অবস্থান হবে। (ক্রমশ...)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 2 Sep, 2021 Issue No.35

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(রিপোর্ট.... ৯ পাতার পর..)

দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, সেবামূলক কাজও কর এবং এর পাশাপাশি নামায পড় ও যাকাত দাও। যাকাতের অর্থই হল নিজের সম্পদকে পবিত্র করা। আর সম্পদের শুদ্ধিকরণ হয় আল্লাহ তা'লার সৃষ্টির সেবায় সেই সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে। অতএব প্রকৃত মুসলমানরা এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং আমরা আহমদীরা দাবি করি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা এর উপর অনুশীলনও করি। এই কারণে সারা বিশ্বে আহমদীরা যেখানেই তবলীগ করে, ইসলামের বাণীর প্রসার করে, সেখানে মানব সেবামূলক কাজও করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে দরিদ্র দেশসমূহে বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলিতে বা এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে আমাদের স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিভেদ ছাড়াই সেবা করে চলেছে। আমাদের হাসপাতালের ৯০ শতাংশ রোগী খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। আমাদের স্কুলগুলির ৯০ শতাংশ ছাত্র খৃষ্টান অথবা তাদের কোন ধর্ম নেই, কিম্বা তারা অন্য কোন ধর্মের। তাদের মধ্যে মেধাবী ছাত্রদেরকে কোন তারতম্য ছাড়াই বৃত্তি দেওয়া হয়। কেবল এই জন্য যে, এটি একজন মানুষের অধিকার যে যদি পরিস্থিতির কারণে কোন কোন বিষয় থেকে সে বঞ্চিত থেকে যায় তবে সাধ্যমত তাদেরকে যেন সাহায্য করা হয় এবং তাদের সেই বঞ্চনা মেটানো হয়। এটিই মানবতার সেবা।

এখানে মসজিদের কথা বলা হচ্ছে, মসজিদ ইবাদতের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়ে থাকে, কিন্তু কুরআন করীমে একথাও বলা হয়েছে যে, তোমাদের নামায তোমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। একদিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইবাদত করার আদেশ দেন অন্যদিকে তিনি বলেন যে, তোমাদের ইবাদত বা নামায তোমাদের মুখে ছুড়ে মারব। এটিকে তোমাদের বিরুদ্ধে করে দেওয়া হবে। কেননা তোমরা দরিদ্রদের প্রতি দৃষ্টি দাও না। তোমরা অনাথদের প্রতি যত্নবান নও। তোমরা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর। এই কারণে তোমাদের নামায গৃহীত হবে না। অতএব একথা একজন প্রকৃত মুসলমানের কল্পনার অতীত যে, কোন প্রকারের ফিতনা বা নৈরাজ্যের সঙ্গে তার নাম যুক্ত হতে পারে।

মসজিদ উদ্বোধন করতে যাওয়ার সময় আপনাদের একজন ন্যাশনাল টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেন যে, ছোট শহরে মসজিদ নির্মাণ করার পিছনে আপনাদের উদ্দেশ্য কি? আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম যে, এখানে আহমদীরা বাস করে। অনুরূপভাবে খৃষ্টান, ইহুদী এবং হয়তো অন্যান্য ধর্মের মানুষও বাস করে। তিনি বলেন এখানে ১২০টি জাতির মানুষ বসবাস করে। তাই প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্ম অনুযায়ী ইবাদত করার জন্য উপাসনাগার তৈরী করেছে। আমরা আহমদী মুসলমানদেরও একটি উপসনাগারের প্রয়োজন ছিল যা এখন নির্মিত হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'লার ইবাদতের দায়িত্বও পালন করি এবং মানবতার সেবার কাজও উত্তমরূপে পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদন করতে পারি। আর এটিই আমদের উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যেই আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে থাকি এবং প্রকৃত ইসলামের বাণী প্রচার করে করে থাকি।

এই স্থানটি একসময় বাজার ছিল। আজ এটিকে মসজিদের রূপান্তরিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে জার্মানীর আরও একটি শহরে (শহরটির নাম স্মরণে আসছে না) একটি স্থানে একসময় বাজার ছিল, পরবর্তীতে সেটিকে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও তাদেরকে বলা হত যে, এখানে মার্কেট ছিল, যেখানে মানুষ পার্থিব সামগ্রী কেনাকাটা করত। এখন এই স্থানটিকে মসজিদের রূপ দেওয়া হয়েছে যাতে এখানে সেই সমস্ত মানুষের সমাগম হয় যারা আধ্যাত্মিক বস্তু বিনিময় করে, খোদা তা'লার ইবাদত করে, খোদার বাণী শোনে এবং যারা মানবতার সেবার জন্য পরিকল্পনা করে থাকে। মানুষের ধারণা, মসজিদ তৈরী হওয়ার পর মুসলমানরা হয়তো কোন ষড়যন্ত্র রচনা করবে বা শহরের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের ক্ষতি করবে। এটি নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। জামাত আহমদীয়া যেখানেই সর্বত্রই মসজিদ নির্মাণ করে এবং সেখানে 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারোর পরে' মন্ত্রের পূর্বাপেক্ষা অধিক উপর জোর দিয়ে থাকে। এবং প্রতিবেশী ও

বিশ্ববাসীকে ঘোষণা দিয়ে থাকে যে একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের এটিই কর্তব্য। ধর্ম বিবাদ ও কলহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আসে নি। ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রত্যেক নবী ভালবাসার শিক্ষার প্রসার করতে এসেছিলেন। তাঁরা সেই খোদার পক্ষ থেকে এসেছিলেন যিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন।

অতএব জামাত আহমদীয়ার এটিই বাণী এবং আপনাদের উদ্দেশ্যেও এই একই বার্তাই দিব। আমাদের প্রতিবেশীরা এখন দেখবে যে, মার্কেট থেকে মসজিদে রূপান্তরিত এই স্থানটি থেকে ইবাদতকারীরা নিজেরা আধ্যাত্মিকরূপে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি তার চার পাশের মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা ছড়িয়ে দিবে। পূর্বে আপনারা মার্কেটে অর্থ দিয়ে জিনিস কিনতেন, কিন্তু এখানে বিনা অর্থ ব্যয়ে আপনারা ভালবাসার নমুনা দেখবেন। ভালবাসার উপহার পাবেন। পূর্বে আপনারা পকেটের পয়সা খরচ করে কোন জিনিস কিনতেন, কিন্তু এখানে সেই সমস্ত মানুষ এখানে ইবাদত করতে আসবে যারা নিজেদের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে প্রতিবেশীদের জন্য ভালবাসার উপহার দিবে আর এটিই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার নমুনা। আহমদীদেরকে এই নমুনাই এখানে প্রদর্শন করতে হবে। এরা যদি নিজেদের দৃষ্টান্ত তুলে না ধরে তবে তারা আহমদী মুসলমান হওয়ার যোগ্য নয়। এই মসজিদ নির্মাণের পর আহমদীদের উপর পূর্বের থেকে বেশি দায়িত্ব বর্তাবে যেন তারা প্রতিবেশীদের প্রতি যত্নবান থাকে, তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার বিষয়ে সচেতন থাকে কিম্বা তাদেরকে যেন আধ্যাত্মিক বা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়। এমনটি করা হলে তবেই তারা এই মসজিদের নাম 'আফিয়াত' কে স্বার্থক করে তুলবে। 'আফিয়াত' আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার 'আফিয়াত' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে স্থান পায় তখন সে সকল অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে একথাও বলেছেন যে, আমি বান্দাদেরকে আমার গুণাবলীকে শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে ধারণ করার আদেশ দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার 'আফিয়াত'-এর গুণ আমাদের কাছে দাবি করে যে, সেই সব আহমদীরা যারা এখানে বসবাস করে, তারা যেন এই শহরের বাসিন্দা এবং বিশেষ করে প্রতিবেশীদেরকে যথাসাধ্য নিরাপত্তা প্রদান করে এবং কখনোই যেন তাদের পক্ষ থেকে কোন ক্ষতি না পৌঁছায়।

আমি আশা করি, আমরা যদি এই কাজ করতে সক্ষম হই তবে যাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সংশয় ও সংকোচ রয়েছে তা দূরীভুত হবে। যদিও বলা হচ্ছে যে, প্রতিবেশীরাও সহযোগীতা করেছে, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে, এই শহরের মানুষ জামাতের সঙ্গে সেভাবে পরিচিত নয় যেভাবে অন্যান্য শহরে জামাতের পরিচিতি আছে। তাই এই মসজিদটি নির্মাণের ফলে জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে।

লর্ড মেয়রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলেন, মসজিদ হল হিরের মত। আর এটি অবশ্যই একটি হিরের টুকরো। আহমদী মুসলমানরা যদি অপরকে এই হিরেটি চেনাতে সক্ষম হয় তবেই এটি লোকের চোখে পড়বে। যদি প্রতিবেশীর অধিকার না দেন, শহরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়ান তবে লোকে বলবে যাকে আমরা হিরে মনে করেছিলাম সেটি নকল প্রমাণিত হল। অতএব এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার ফলে আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। আমি একদিকে অতিথিবর্গকে বলব যে, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। ইনশাল্লাহ্, আপনাদেরকে আহমদীদের পক্ষ থেকে কোন ধরণের কষ্ট দেওয়া হবে না। বরং এই মসজিদটি শান্তি, নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে উঠবে। অপরদিকে আহমদীদেরকে বলব যে, কুরআনী শিক্ষার উপর পূর্বের তুলনায় বেশি মনোযোগ দিয়ে প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করার চেষ্টা করুন। প্রতিবেশীর অধিকার অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এতটাই ব্যাপক যে, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে এত বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এক সময় আমি ধারণা করতাম, প্রতিবেশীকেও হয়তো উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। ইসলামে প্রতিবেশীর এতই গুরুত্ব। অতএব যখন এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তখন আমরা কিভাবে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে পারি। ইনশাল্লাহ্ আমরা প্রতিবেশীদের দুঃখ -কষ্ট লাঘব করব এবং অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করব। আমাদের পক্ষ থেকে কোন ভীতি বা অনিষ্টের আশঙ্কা করো না যে, এরাও অন্যান্য মুসলমানদের মত না হয়, কেননা মুসলমানরা আজকাল দুর্নামের শিকার।

একজন বক্তা অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন- বেলজিয়ামের জুলুম-অত্যাচার, খুনাখুনি, স্টকহোমের হামলা, লন্ডনের হামলা। কিছু মুসলমান নিজেদের দেশেও এই সব কাজ করছে। মুসলমান অপর এক মুসলমানকে হত্যা করছে। তাই মুসলমানরা কেবল অ-মুসলিমদেরকেই হত্যা করতে চায় না বরং ইসলামের নামে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে তারা যাকে সামনে পায়, যে কেউ তাদের বিরোধীতা করে তাকেই তারা হত্যা করে। এই কারণে অসংখ্য মুসলমান মুসলমানের হাতে খুন হচ্ছে।

(ক্রমশ...)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir